Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ 228020759

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ 228020759

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা আক্তার, আইডিঃ 228020759 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আরিফা আক্তার

আইডিঃ 228020759

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

নাস্তিকবাদ কি? 6

আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য: 7

বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিক্যবাদীদের গুরু: 9

হুমায়ুন আজাদের পাক সার জমিন সাদ বাদ: 10

ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদী প্রচারণার আধিপত্য: 13

নাস্তিক্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাবেশ: 15

নাস্তিকতার অবাস্তব প্রস্তাবনা: 18

অপ্রমাণ্য নাস্তিকতা 23

নাস্তিক্যবাদীদের ভণ্ডামি 28

নাস্তিকরা কেন ইসলাম বিদ্বেষী? অন্য ধর্ম কেন নয়? 29

নাস্তিক্যবাদ এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন 30

বাংলাদেশে সেক্যুলার নাস্তিকেদের মূল উদ্দেশ্য কি? 35

নাস্তিকদের ছোবলে দেশের যুবসমাজ 36

ওরা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না 42

নাস্তিকদের অসততা- একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : পর্ব-১ 45

নাস্তিকদের অসততা- আরো একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : পর্ব-২ 49

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাস্তিকতা এবং প্রতিকার 53

নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয় 54

নাস্তিকদের প্রতিরোধের উপায় 55

দরকার ইসলামের সপক্ষে একাধিক মিডিয়া 56

সোশ্যাল মিডিয়া, নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয় 57

নাস্তিকদের সাথে কথাপকথন 61

আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব?...69

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা 71

উপসংহার 73

ভূমিকা

নাস্তিক্যবাদ (ইংরেজি ভাষায় : Atheism; অন্যান্য নাম : নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতাবাদ) একটি দর্শনের নাম যাতে ঈশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং সম্পূর্ণ ভৌত ও প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়। আস্তিক্যবাদ বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়। নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। [বাংলা ইউকিপিডিয়া]

ইংরেজি ‘এইথিজম’ (Atheism) শব্দের অর্থ হল নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদ। এইথিজম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক ‘এথোস’ শব্দটি থেকে। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি অন্ধবিশ্বাসকে যুক্তি দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে। দিনদিনমুক্ত চিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না। জপানের৬৪% থকে ৬৫% নাস্তিক অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী। রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ৪৮% এবংইউরোপিয় ইউনিয়নে৬% (ইতালি) থেকে শুরু করে ৮৫% (সুইডেন) পর্যন্ত।

পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণভাবে ধর্মহীন বা পারলৌকিক বিষয়সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তুবৌদ্ধ ধর্মেরমত যেসব ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় না, সেসব ধর্মালম্বীদেরকেও নাস্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন,যুক্তিবাদ, মানবতাবাদএবংপ্রকৃতিবাদেবিশ্বাস করে।

নাস্তিকরা কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা বিশেষ কোনো আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ, যে কোনো মতাদর্শের সমর্থক হতে পারে, নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গায়ই, তা হলো, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করা। [বাংলা মুক্ত বিশ্বকোষ ইউকিপিডিয়া]

নাস্তিকবাদ কি?

নাস্তিকবাদ কী এনিয়ে সুন্দর একটা লজিক নিচে দেওয়া হলো ?
আমার জীবনে দেখা সেরা একটি লজিক।এটি Dr. Wayne Dyer এর 'Your sacred self' বইয়ের একটি কাল্পনিক কথোপকথন।

একটি মাতৃগর্ভে জমজ দুই শিশুর মধ্যে কথা হচ্ছে। তাদের প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলো,- 'তুমি কি প্রসব পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করো?'

দ্বিতীয়জন বললো,- 'অবশ্যই করি। নিশ্চয় প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছু আছে।হয়তো প্রসব পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির জন্যই আজ আমরা এখানে।'

প্রথমজন বললো,- 'আরে বোকা! প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছুই নেই। তোমার সেই কাল্পনিক জগত কেমন হতে পারে বলোতো দেখি?'

দ্বিতীয়জন বললো,- 'আমি ঠিক জানিনা।তবে হতে পারে সেখানে এখানের(মাতৃগর্ভ) তুলনায় আলো অনেক বেশি হবে। হতে পারে সেখানে আমরা আমাদের পা দিয়ে হাঁটতে পারবো। আমাদের মুখ দিয়ে নিজেরাই খাদ্য গ্রহন করতে পারবো। হয়তো সেই জগতে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় থাকবে যা আমরা এখন কল্পনা করতে পারছিনা।'

প্রথমজন বললো,- 'এটা নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।পা দিয়ে হাঁটাহাঁটি? অসম্ভব। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহন? অলিক কল্পনা। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টি আসে এই নাড়ির মাধ্যমে।কিন্ত নাড়ির এই স্বল্প দৈর্ঘ্য কখনোই প্রসব পরবর্তী জীবনের পক্ষে যুক্তি হতে পারেনা। প্রসব পরবর্তী জীবন বলে আদৌ কিছু নেই।এটা বাতুলতা।'

দ্বিতীয়জন বললো,- 'আমি মনে করি প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছু আছে এবং সেটা এই মাতৃগর্ভের জীবনের চেয়ে ভিন্ন।হতে পারে সেখানে বাঁচার জন্যে আমাদের এই নাড়ির দরকার হবেনা।'

প্রথমজন উত্তর দিলো,- ' প্রসব পরবর্তী জীবন বলে যদি কিছু থেকে থাকে,তাহলে সেই জীবন থেকে কখনো কেউ এই জীবনে ফেরত আসেনা কেনো? আসলে প্রসবের পরের জীবন বলতে

কিছুই নেই।প্রসব হচ্ছে জীবনের শেষ। এরপর আর কিছু নেই।আছে কেবল অন্ধকার আর শুন্যতা।'

'আমি ঠিক জানিনা।'- দ্বিতীয়জন বললো।
সে আরো বললো,- 'হতে পারে সে জগতে আমাদের সাথে আমাদের মায়ের দেখা হবে।মা হয়তো সে জগতে আমাদের দেখাশুনা করবেন।'

প্রথমজন হাসতে লাগলো, আর বললো,- ' মা? তুমি 'মা' তে বিশ্বাস করো? এটা সত্যিই হাস্যকর! যদি মা বলে কেউ থেকে থাকে,তাহলে সে এখন কোথায়?'

দ্বিতীয়জন বললো,- 'সে আমাদের চারপাশে বিরাজমান। সে আমাদের ঘিরে আছে।আমরা তার মাঝে বেঁচে আছি। তাকে ছাড়া এই জগত অসম্ভব।এই পৃথিবী অসম্ভব।'

প্রথমজন বললো,- 'যেহেতু আমরা মা বলে কাউকে দেখিনা,অনুভব করিনা।সুতরাং, এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা এই যে, আসলে মা বলে কেউ নেই।'

দ্বিতীয়জন মুচকি হেসে বললো,- 'মাঝে মাঝে যখন তুমি নীরব থাকো, তখন মনোযোগ সহকারে যদি খেয়াল করো তাহলে তুমি তার উপস্থিতি টের পাবে।তুমি তার কন্ঠ শুনতে পাবে।বুঝতে পারবে তিনি তার দরদভরা মধুর কন্ঠে উপর থেকে আমাদের ডাকছেন।'

পরকাল দেখা যায়না, স্রষ্টাকে দেখা যায়না, অনুভব করা যায়না বলে যারা তাতে বিশ্বাস করতে চায়না, হেসে উড়িয়ে দেয়, তাদের জন্য এটি একটি দারুন উত্তর।

***Quora ওয়েবসাইট থেকে নাস্তিকবাদ নিয়ে মেহেদী হাসানের কমেন্টটা দারুণ লেগেছে তাই এখানে তুলে ধরছি।

আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য:

আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য কি সেটা জানার জন্য দুইজনের মন্তব্য তুলে ধরছি। আশা করি মন্তব্য দুইটা পড়লে আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

Quora ওয়েবসাইটে মো: নূর হাবিব আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য নিয়ে মন্তব্য করেছেন ;

একজন মানুষ খারাপ কাজ করল যেমন, কাউকে হত্যা করল, চুরি করল, মানুষকে কষ্ট দিল, মানুষের অধিকার জোর করে কেড়ে নিল, রেপ করল এবং একদিন মরে গেল! দুনিয়াতে তার কোন বিচারই হল না, নাস্তিক থিওরী অনুযায়ী সে দুনিয়াটাকে উপভোগ করেছে! কারণ, যেহেতু সে মরে গেল তাই সে মুক্তি পেল, তার কোন বিচারই হল না! আর যাদের সে অত্যাচার করল, ক্ষতি করল তারা শুধু চোখের পানি ফেলবে, দুঃখ পাবে যে পর্যন্ত বেচেঁ থাকবে, তারপর মরে যাবে আর তার সকল দুঃখের অবসান হবে। কোন বিচার নেই, কোন জবাবদিহিতা নেই। কর যা খুশি, কে আছে বাধা দেওয়ার। বাহ! কি সুন্দর যুক্তি!

একজন মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করল আর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নিঃস্বার্থভাবে ভাল কাজ করল যেমন, মানুষের উপকার করল, কাউকে তার নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করল না, ঘুষ খেল না, সৎভাবে জীবন যাপন করল, মানুষের মুখে হাঁসি ফুটালো তারপর একদিন মরে গেল। সে তার ভাল কাজের জন্য কোন প্রতিদানই পাবে না। কারণ, নাস্তিক থিওরী অনুযায়ী পরকাল বলে কিছু নেই!

পরকাল যদি নাই থাকে তাহলে এই ভাল কাজ আর খারাপ কাজ করার মধ্যে পার্থক্য কি? আমাকে যদি কারো কাছে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহী নাই করতে হয় তাহলে আমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? পরকাল বলে যদি কিছূ নাই থাকে, তাহলে ভাল কাজ করলেই কি আর অপরাধ করলেই কি? নাহ কিছুই যায় আসে না! কারণ, আমাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে, কারো কাছে পাপ-পূণ্যের হিসাব দিতে হবে না। বাহ, আমরা কত স্বাধীন!

এইটাই কি জীবন? খাও, দাও আর ফূর্তি কর, দুনিয়াটা মস্ত বড়! এই জীবনের মূল্য কি? কারণ, যেখানে খারাপ কাজের কোন অপরাধবোধ থাকবে না যেহেতু পরকাল নেই; কাউকে মারলাম, অন্যায়ভাবে তার সম্পদ কেড়ে, নিলাম আর বললাম আহ কি শান্তি! বল্গাহীন স্বাধীন জীবন।

আপনারা এই থিওরীতে সত্যিই বিশ্বাস করেন! সত্যিই কি এইটা যুক্তিযুক্ত? নিজের একদম ভিতর থেকে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো।

যাই হক এখন বুঝলেন নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য কি?”

আরেকজন অন্য আরেক সাইটে নাম উল্লেখ না করে আস্তিক ও নাস্তিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

উনি লিখেছেন ;

“keya বা aeromatics সাবানের এ্যড দেখেছেন?ঐ যে হাতের কোন স্পর্শ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় মেশিনে তৈরি।সাদা চোখে দেখলে সব সাবান কোন মানুষ বা কোন প্রানীর সাহায্য বা ভুমিকা ছাড়াই কি সুন্দর অটোমাটিক প্রস্তুত হচ্ছে।নাস্তিকেরা গোটা বিশ্বব্যবস্থকে দেখে সেভাবে।সব কিছু কিছুতো সিস্টেমিটাকালি হচ্ছে।এখানে কোন বুদ্ধিমান সত্বার অস্তিত্ব কই?

কিন্তু একজন গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন সম্পন্ন লোক ঐ স্বয়ংক্রিয় মেশিনের পিছনে দেখেন মানুষের ভুমিকা।মানুষ সেটি তৈরি করে প্রোগ্রাম সেট করে দেয়াতেই মেশিনটি এত সুচারুভাবে চলছে।নইলে একটা জড় মেশিনের কী সাধ্য এত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আপনাআপনি সব কাজ করার!একজন আস্তিক ভাবেন এই গোটা বিশ্ব নিশ্চয়ই কোন একজন মহামহিম বিজ্ঞ স্রষ্টা সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করেছেন।

নাস্তিক দেখেন,বৈজ্ঞানিক ভাবে পানি থেকে মেঘ হচ্ছে,সেখান থেকে বৃষ্টি।সেই বৃষ্টি পাহাড় থেকে নেমে নদী হয়ে সাগরে মিশেছে।এতে কোন খোদার অস্তিত্ব তো দেখা যায়না।

আস্তিক ভাবেন এক বুদ্ধিমান খোদা এমন ভাবে সফটওয়্যার করে দিয়েছেন বলেইনা সব সুনিপুনভাবে হয়ে যাচ্ছে ।নইলে জড় কি পারে নিজেকে পরিকল্পনামাফিক এমন করে সাজাতে?”

আশা করি আপনাদের এই দুইটা মন্তব্য পড়ে আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য ক্লিয়ার হয়ে গেছে ইন শা আল্লাহ।

বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিক্যবাদীদের গুরু:

আহমদ শরীফের পর তার ভাবশিষ্য গণধিকৃত ও দেশান্তরিত সস্তা লেখিকা তসলিমা নাসরিন এবং তার মতো আরেক জ্ঞানপাপী ড. হুমায়ুন আজাদ বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিকতায় পথিকৃতের ভূমিকা রাখেন। ইউকিপিডিয়ায় তাঁর ধর্ম পরিচয়ে লেখা আছে, ‘স্বঘোষিত নাস্তিক’। সেখানে তাঁর বিশ্বাস ও দর্শন উপশিরোনামে বলা হয়েছে, ‘হুমায়ুন আজাদ ছিলেন স্বঘোষিতনাস্তিক। তাঁর অন্যতম প্রণোদনা ছিল প্রথা-বিরোধিতা। কবিতা, উপন্যাস ও রচনা সর্বত্রই তিনি প্রথাবিরোধী ও সমালোচনামুখর। তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেই মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজ গড়ার পক্ষে অনুকূল বলে মনে করতেন। [প্রাগুক্ত]

হুমায়ুন আজাদ রাড়িখালের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ইন্সটিটিউশনথেকে ১৯৬২সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। মেধাবী ছাত্র আজাদ ১৯৬৭সালেঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি এবং১৯৬৮সালে একই বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৭৬ সালে তিনিএডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেভাষাবিজ্ঞানেপিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বাংলা ভাষায় সর্বনামীয়করণ। তাঁর স্ত্রী লতিফা কোহিনুর। তাঁর দুই কন্যা মৌলি আজাদ, স্মিতা আজাদ এবং একমাত্র পুত্র অনন্য আজাদ। হুমায়ুন আজাদ১১ আগস্ট২০০৪ সালেজার্মানিরমিউনিখশহরে মৃত্যুবরণ করেন।[প্রাগুক্ত]

১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধের বই নারী। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালে বইটি নিষিদ্ধ করে। অবশ্য ৪ বছর পর ২০০০ সালে বইটি আবার পুনর্মুদ্রিত হয়। তাঁর লিখিত 'আমার অবিশ্বাস' (১৯৯৭), 'ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য' (২০০৪), 'প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে' (১৯৯২) '১০,০০০, এবং আরো একটি ধর্ষণ' (২০০৩), এবং 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' (২০০৪) প্রভৃতি বইতে চরম ধর্মবিদ্বেষ ও জ্ঞানপাপের পরিচয় দিয়ে ধর্মবিশ্বাস বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধে মুক্ত কৃপাণ হাতে হামলা চালিয়েছেন। তাঁর লিখিত অনেকগুলো বই থেকে কেবল চরম ইসলামবিদ্বেষী, অরুচিকর ও পাঠকনিন্দিত উপন্যাস 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আলোচনা উপস্থাপন করছি। এ থেকেই যে কোনো পাঠক লেখকের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামবিদ্বেষ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন আশা করি।

হুমায়ুন আজাদের পাক সার জমিন সাদ বাদ:

বিখ্যাত হুমায়ুন আজাদের কুখ্যাত পাক সার জমিন সাদ বাদ বেশ কবার শুরু করেছি। অতি কষ্টেও দশম পৃষ্ঠা পেরোতে পারি নি। সম্ভবত চতুর্থবারের মতো এবার শেষ করার পণ নিয়ে শুরু করি। এবারও বুঝি রণে ভঙ্গ দিতে হয়। একদিনে ৩৮ পৃষ্ঠা পড়া হয়। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রত্যেক শব্দ-হরফের অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ হেন ব্যবহার নেই যা তিনি এখানে আনেন নি। জানি না শিল্পিত বর্ণনায় এমন অশিল্পীসুলভ উপন্যাস দ্বিতীয়টি রচনা করেছেন কিনা। অন্ধ বিদ্বেষ, নির্জলা মিথ্যা আর কল্পনার অপব্যবহার কী ও কেমন তা জানতে এরচে আদর্শ কোনো বই হয় না। সংবাদপত্রের মতো উপন্যাসও সমাজের দর্পণ। সে অর্থে আলোচ্য উপন্যাস প্রয়োজনীয় পাশ নাম্বারও পায় না। লেখক জোর করে যেসব চরিত্র ও চিত্র উপস্থাপন করেছেন তার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের মুসলিমপ্রধান সমাজে একটিও দেখানো সম্ভব নয়। অথচ বিবেকের মাথা খেয়ে

লেখক এমনই সব চরিত্র বাংলাদেশের ইসলাম ও ডানপন্থী বৃহত্তম দল দুটির ওপর চাপিয়েছেন। ইসলামবিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে লেখক যে বাংলাদেশের একটি বড় দলের দালালির এজেন্ডাও রাখতেন, তা এ উপন্যাসেই প্রথম টের পেলাম।

প্রতিভা থাকলেই তা পূজনীয় নয়। সুন্দর প্রতিভার যিনি অসুন্দর প্রয়োগ ঘটান, তিনি স্রষ্টার অকৃতজ্ঞ বান্দাই শুধু নন; আত্মোম্ভরি প্রচণ্ড জ্ঞানী শয়তানেরও দাস। এতদিন ইসলামবিদ্বেষী জানা সত্ত্বেও লেখকের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতাম, এখন জানলাম তিনি শুধু জ্ঞানী নন; জ্ঞানপাপী। এমনকি জ্ঞানপাপীই শুধু নন, বিবেকপ্রতিবন্ধীও। যে কোনো জাতি-ধর্মের লেখক কিংবা বিদগ্ধ পাঠক এমন বিকারগ্রস্ত বাস্তবতাবিবর্জিত আরোপিত চরিত্রের উপন্যাসের নিন্দা না করে পারবেন না। এদেশের তথাকথিত কিছু প্রগতিশীল লেখক এর পক্ষে কীভাবে সাফাই গান তাও গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার। তবে নিজেকে প্রগতিশীলদের কাতারে দেখাতেই যে তারা এমন আবর্জনার গুণ গেয়ে থাকেন, তা গবেষণা ছাড়াই বলা যায়।
লেখক প্রতিটি পৃষ্ঠায় একাধিক প্যারায় বিভিন্ন মানুষ ও দলের চরিত্র হননের প্রয়াস পেয়েছেন। কোনোটাই সবার সামনে উপস্থাপনযোগ্য নয়। যে কোনো দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠকমাত্র ঘেন্নায় নাকে হাত দিতে বাধ্য হবেন। তথাপি একটি প্যারা উল্লেখ করে সামান্য বিশ্লেষণ না করলে কেউ অযথা নিন্দা বা বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ আনতে পারেন। তাই বাধ্য হয়েই একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি : 'জিহাদি হাফিজুদ্দিনটা একটু বেতমিজ, মুখে চমৎকার চাপদাড়ি, স্বাস্থ্যটাও ভালো; একাই দু-তিনটি দোকান ভাঙতে পারে, কয়েকটিতে আগুন লাগাতে পারে, গুলি চালাতে পারে, 'আল্লাহু আকবর', 'আলি আলি জুলফিক্কার' ব'লে ছুরি ঢুকোতে পারে; ফিরে এসে একটির পর একটি এক্সএক্সএক্স দেখতে পারে, সবই ইন্ডিয়ান, বড়ো দুধ আর বড়ো মাজা ওর পছন্দ, চাকরানিটাকে ডেকে এনে ঘণ্টাখানেক ধ'রে অরাল-অ্যানাল-ভ্যাজাইনাল করতে পারে, তারপর উঠে গিয়েই মধুর স্বরে ওয়াজ করতে পারে, ফতোয়া দিতে পারে।'

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ইসলামের শাশ্বত শান্তির সুমহান বাণী প্রচার করে বেড়ানো ওয়ায়েজদেরকে লেখক (১) জিহাদি ও জঙ্গি (২) ধর্ষক ও লম্পট এবং (৩) ভণ্ড ও চরিত্রহীন বানাতে চেয়েছেন। যে কিনা মুখে দাড়ি রেখে মানুষের বাড়ি বাড়ি খেয়ে মোটা-তাজা হয়ে সংখ্যালঘুদের দোকানপাট ভাঙে, তাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, আল্লাহর নাম নিয়ে মানুষ খুন করে, তারপর ব্লু-ফিল্ম দেখে, ইন্ডিয়ান বারবণিতাদের দেখে কাজের মেয়ের সঙ্গে নানাভাবে বিকৃত যৌনাচার চালায়। আর এতসব অপকর্ম করে তিনি মধুর সুরে ওয়াজ করেন আর ফতোয়া দেন! পাঠক বলুন, এমন মারাত্মকসব বিপরীতমুখী চরিত্রের একজন ব্যক্তিও কি দেখাতে পারবেন?

কী বিপদের কথা, এত বড় বড় সব পণ্ডিত লেখকরা যখন ইসলামের হক-বাতিল নানা ফেরকাকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, তখন তাদের মূর্খও বলতে পারি না। হতে পারে তারা সজ্ঞানে সবগুলো ইসলামের সপক্ষশক্তির চরিত্র হনন করে কেল্লা ফতে করতে চান। নিচের উদ্ধৃতি খেয়াল করুন। কিভাবে তিনি ইরানের কট্টর শিয়া আর আফগানের কট্টর সুন্নিদের এক কাতারে এনেছেন। বাংলাদেশের জামাতে ইসলামসহ সব ইসলামিদের একসঙ্গে ভজঘট পাকিয়েছেন :

'জিহাদিদের একটি মহান গুণ হচ্ছে তারা মালাউন মেয়ে পছন্দ করে। আমিও করি, ওদের একটু খেলাতে পারলে ওরা উর্বশীদের মতো নাচে; আমার জিহাদিরা অবশ্য নাচটাচ পছন্দ করে না, ওরা ঢুকতে বেরোতে পারলেই শুকরিয়া আদায় করে। এতে প্রধান প্রতিভা তালেবান মোঃ হাফিজুদ্দিন, ও হয়তো ফেরেশতাদের কাছে থেকে কোনো হালুয়া লাভ করে; তবে মোঃ কেরামত আলি, মোঃ মোস্তফা, মোঃ আকবর আলিও কম যায় না, এটা আমি পছন্দই করি, জিহাদে কোনো কম যাওয়া-যাওয়ি নেই, তাতে জোশ কমে যায়। ওরা যখন একেকটি মালাউন মেয়ের ওপর চড়ে, তখন ওরা মনে করে ওরা একেকটি নাছারা নগর ধ্বংস করছে, যার নির্দেশ রয়েছে। আমি আশ্চর্য হই, ওরা রুহুল্লা খোমেনির কিছুই পড়ে নি, কিন্তু চিন্তা ও কর্মে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

না হলো না। আরও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হয় : 'জামাঈ জিহাদে ইছলাম আমাকে উদ্দীপ্ত করে, আমি প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করি, ওই উত্তেজনা দেহের বিশেষাঙ্গের উত্তেজনার থেকে অনেক বেশি তীব্র, অনেক বেশি প্রচণ্ড; আমি দেখতে পাই আমি বেঁচে উঠছি, আমি বেহেশতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠি। মওলানা মওদুদি, ইমাম গাজালি, আয়াতুল্লা খোমেনির বই, আর কোরান-হাদিছ, নেয়ামুল কোরআন, মুকছেদুল মমেনিন, বেহেস্তের জেওর প'ড়ে আমি বুঝতে পারি এতোকাল আমি ভুল পথে ছিলাম, দোজগের রাস্তায় ছিলাম, এখন আমি ঠিক পথে এসেছি; এখানে সব সময়ই খোয়াব, সব সময়ই উত্তেজনা; পৃথিবীতে মুছলমান আর ইছলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না, এ-বিশ্বাস আমাকে মাতাল ক'রে তোলে- নাউজুবিল্লা, 'মাতাল' শব্দটি ঠিক হয় নি, আল্লা আমাকে মাফ করবেন; এ-সময়ই আমি একটি চমৎকার জীবন পাই। জামাঈ জিহাদে ইছলামে যোগ দেয়ার পর প্রায় সবই পাই, বেহেশত তো পাবোই। যোগ দেয়ার কয়েক মাসের মধ্যে আমি জামাঈ জিহাদে ইছলাম-এর 'মদিনাতুন্নবি' অঞ্চলের নেতা হয়ে উঠি, আমার খুব চেষ্টা করতে হয় না; আমার প্রধান নেতারা বুঝতে পারেন যে-তিরিশটি মাদ্রাছার তালেব এলেম নিয়ে এ-আঞ্চলিক সংঘটি গঠিত, ওই সব হাফেজিয়া ফোরকানিয়া কওমি কামিল দাখিল সাধারণ মাদ্রাছার তালেবানদের মাথায় ঘিলু নেই, যেমন তাদের মাথাও নেই, তাদের মগজ অন্য জায়গায়; তাই যোগ দেয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আমি নেতা হয়ে উঠি, যা আমি কখনো হই নি।'

এ পর্যায়ে এসে আমি উপন্যাসের বাকি পৃষ্ঠাগুলোয়ও নজর বুলাই। আরও কত নোংরা বর্ণনা। অশ্লীল রচনা। লেখক প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় দিয়েছেন ইসলামপন্থী আর লেখকের ভাষায় জিহাদিদের ধর্ষণ ও নারীলিপ্সার কল্পিত দিগম্বর বর্ণনা। ইসলামের অনুসারীদের নানা চরিত্রহীনতা, নষ্টামী ও ভণ্ডামির চতুর উপস্থাপনা। শিল্পিত ভাষায় এবং অশ্লীল বয়ানে যে এমন সাহিত্য তৈরি হতে পারে তা এ উপন্যাস না পড়লে পাঠকের বিশ্বাস হত না। লেখক তার একাধিক বক্তব্যে নিজেকে শুধু নাস্তিক হিসেবেই প্রমাণ করেননি, কুফরির শর্তগুলোও পূরণ করেছেন।

বইমেলা থেকে ফেরার পথে অজ্ঞাত পরিচয়ধারীদের হামলায় তিনি প্রচণ্ড আহত হন। পরবর্তীতে তিনি বিদেশে চিকিৎসা নিতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মারা যান। তার মৃত্যুর পর এমন একজন ধর্মবিদ্বেষী আল্লাহদ্রোহীর জানাযা পড়াতে অস্বীকার করায় মসজিদের ইমামকে সমালোচনার শিকার হতে হয়। যে ইমাম তথা দীনদারদের সমালোচনা আর কলঙ্কিত করা ছিল মৃত লোকটির জীবনের প্রধানকর্ম তার জানাযা পড়াতে বাধ্য করা হয় তেমনি এক ইমামকে। নাস্তিক আর প্রগতিশীলদের স্ববিরোধ আর ভণ্ডামির এও এক নজির। আরে বাবা, এতই যদি তুমি ইসলামকে ঘৃণা করো, কুরআন আর আল্লাহকে অস্বীকার করো তবে কেন তোমাকে মৃত্যুর পর ইসলামের নিয়মে দাফন করা হবে? তোমাকে তো মাটিতে পুঁতে রেখে আসা উচিত।

এমন দেশ-ধর্ম ও বিবেকবিরোধী লেখার জন্য লেখকের মরণোত্তর ফাঁসি দেওয়া উচিত। আর আখিরাতে তাদের অবস্থা কী হবে সে তো বলাইবাহুল্য। যারা এখনো তার আদর্শের ধারক ও প্রচারক হয়ে বেঁচে আছেন, তাদেরকে সময়ের আগে সোজা হয়ে যাবার, সুপথে ফিরে শান্তির জীবন লাভের আহ্বান জানাই। মরার পর যখন আত্মীয়-পরিজন-সুহৃদরা আপনার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ আর বেহেশত কামনা করবে, তার আগেই হেদায়েতের পথ ধরুন। পৃথিবীর জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি আল্লাহর দেয়া অবিনশ্বর জ্ঞানেরও স্বাদ নিন। নিজেকে জানুন এবং আল্লাহকে চিনুন।

© https://www.hadithbd.com

ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদী প্রচারণার আধিপত্য:

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে মত প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠা ব্লগকে একশ্রেণীর যুবক ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, মহানুভব নবী মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈদ, সালাত, সিয়াম ও হজ সম্পর্কে কদর্য ভাষায় বিষোদ্গার করে মুসলমানদের ঈমান ও আকীদায় আঘাত হানছে। তাদের কুৎসিত ও অশ্লীল লেখা পড়লে যে কোনো মুসলমানের স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি বিবেকবান অমুসলিমদেরও গা শিউরে ওঠার কথা। ব্লগে ইসলামী বিধান, রীতি-নীতিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায়। নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক কাহিনী ও মতামত লেখা হচ্ছে অবলীলায়। ধর্মদ্রোহী ব্লগারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিরপুরে খুন হওয়া শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহমেদ রাজিব হায়দার ওরফে থাবা বাবা।

নিহত ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ব্লগার রাজিব :

ইসলাম বিদ্বেষী কুখ্যাত ব্লগার রাজিব আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। সে শুধু একজন স্বঘোষিত নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী মুরতাদই ছিল না, যথারীতি একজন লম্পট ও নারীলোলুপ নেশাকারীও ছিল। পত্রিকান্তরে সেসব খবর বেরিয়েছে। রাজিব খুন হওয়ার পর থেকেই এর জন্য বাংলাদেশের একটি ইসলামী দলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তোলা হয়েছে। অথচ পুলিশি তদন্তে প্রথমেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তার স্ত্রী ও প্রেমিকাকে। অকুস্থলে তার ল্যাপটপে নারীর চুল পাওয়া গেছে বলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

দৈনিক ইনকিলাবে রাজিব নামের এ আলোচিত ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার সম্পর্কে জেনে অবাক হয়ে গেলাম। সে যা লিখেছে তা মুসলিম বা অমুসলিম তো দূরের কথা কোনো ভদ্র মানুষের ভাষা হতে পারে না। সে কোথাও কোথাও নিজের এবং নিজ সতীর্থদের পীর ড. হুমায়ুন আজাদকেও ছাড়িয়ে গেছে। ওসব লিখে সে নিজেকে ইসলাম থেকে ছিন্ন করে নিয়েছে।

রাজিব ‘নুরানী চাপা’ নামের একটি ব্লগে নিয়মিত লেখালেখি করত। সেখানে ‘মোহাম্মকের (মোহাম্মদ+আহাম্মক) সফেদ লুঙ্গি, ঈদ মোবারক আর ঈদের জামাতের হিস্টরি, ঢিলা ও কুলুখ, সিজদা, হেরা গুহা, ইফতারি ও খুর্মা খেজুর, সিয়াম সাধনার ইতিবৃত্ত, লাড়াইয়া দে, মদ ও মোহাম্মক, আজল’ ইত্যাদি শিরোনামে বেশ কিছু বিতর্কিত ব্লগ লিখেছেন।
রাজিব ও রাজিবের মতো আরো যারা নাস্তিক আছে ওদের নাম বা ওদের বিশ্রী, নোংরা ব্লগ গুলো এখানে তুলে ধরতে আমার রুচিতে দিচ্ছে না।
এক রাজিব লোকান্তরে কিন্তু বহু রাজিব অনলাইনে।
এদের ভাষা ও বক্তব্য এতটাই নোংরা যে এসবের জবাব দেয়াটাও কোন ভদ্র মানুষের রুচিতে আসে না।

তবে আশার কথা, ষোল কোটি মানুষের মধ্যে নাস্তিকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যাবে, এত কম। অন্যদিকে শঙ্কার কথা হল, কম হলেও এরা কখনোই বসে নেই। মানুষের বিশ্বস্ত সমাজে সারাক্ষণই এরা সিঁদ কাটছে ইঁদুরের মতো। এদের নির্বিরাম তৎপরতায় বাংলাদেশে এখন অনেক ইঁদুরের গর্ত। দেশের স্বাধীনতার ভিত্তিভূমির সুরক্ষার প্রয়োজনে এই ইঁদুরগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

©https://www.hadithbd.com

নাস্তিক্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাবেশ:

নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক। বাংলাদেশে সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক দলের কিছু নেতার ফাঁসির দাবিতে রাজধানী শাহবাগ চত্বরে বাম ও নাস্তিকদের নেতৃত্বে কথিত গণজাগরণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। একদল দলনিরপেক্ষ তরুণের হাতে শাহবাগ চত্বরে জামায়াতে ইসলামীর নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে আন্দোলনের সূচনা। গোড়ায় তাদের দাবিগুলোও ছিল অরাজনৈতিক। আয়োজকরা যদিও রাজনীতিকদের বক্তব্য না দেবার যুক্তি দেখিয়ে বলবেন, শুরুর মতো শেষ পর্যন্ত আন্দোলন তার নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রেখেছে। তবে বাস্তবতা হলো, পরবর্তীতে ক্রমেই এ আন্দোলন দলীয় লোকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সরকার নিজেই এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রিকায় তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে দেশের বাম অধ্যুষিত ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়াগুলো এ আন্দোলন থেকে তাদের আদি স্বার্থ উদ্ধারে মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে দাবির তালিকায় একে একে যোগ হয় নানা অগণতান্ত্রিক, ইসলামবিদ্বেষী ও দেশবিরোধী ধারা।

দাবি হতে পারত অপরাধীদের ফাঁসি চাই যদি সত্যিই তারা দোষী হয়ে থাকেন। অথচ এখন কথিত সব রাজাকারেরই ফাঁসি দাবি করা হচ্ছে। তাতেও সমস্যা ছিল না যদি প্রকৃতই সবাই রাজাকার হতেন। এখন রাজাকার বলতেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে একটি সম্প্রদায় কিংবা নির্বিচারভাবে টুপি-দাড়িওয়ালাদের দিকে। আরও ভয়ঙ্কর প্রবণতা হলো, বামদের মতলবি শ্লোগানে গলা না মেলালেই তাকে বলা হচ্ছে রাজাকার! স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াও রাজাকার! বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে নির্ভয় ও অকুণ্ঠ প্রতিবাদকারী মুক্তিযুদ্ধের অনন্য বীর কাদের সিদ্দিকীও রাজাকার! বলি, আন্দোলনের ফলে যদি একশ রাজাকারের যোগ্য শাস্তি হয় আর ফাঁসি হয় মাত্র একজন নির্দোষ ব্যক্তির তবে কি লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে না? আইনশাস্ত্রের ভাষায় তো দশজন অপরাধীর শাস্তির চেয়ে একজন নিরপরাধীকে বাঁচানো উত্তম।

সন্দেহ নেই নিরপেক্ষ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে কোনো অপরাধীর ন্যায্য ও প্রাপ্য শাস্তি দাবি করা একটি প্রশংসনীয় কাজ। এ কাজে আর সবার মতো আমারও সমর্থন প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাই বলে কি এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থনকে দেশের প্রতি ভালোবাসার অপরিহার্য শর্ত মনে করা যায়? কোনো কারণে এ আন্দোলনে সমর্থন না করতে পারলে কি তার দেশপ্রেম মিথ্যে হয়ে যাবে? সাধারণ মানুষ আড়ালের অনেক খবর জানেন না। মিডিয়ার কারসাজি আর পুতুলখেলা অনেকেই বুঝতে পারেন না। কিন্তু যিনি অন্তরালের খবর রাখেন, মিডিয়ার ভেতরের অবস্থা যার নখদর্পনে তিনি তো ভিন্নমত দিতেই পারেন। এমতাবস্থায় দেশপ্রেমিক হিসেবে তার দায়িত্ব নয় কি অন্যদেরও প্রতারিত হওয়া থেকে সাবধান করা? অন্যের স্বার্থ হাসিলের গুটি হওয়া থেকে সতর্ক করা?একটি শান্তিপূর্ণ গণজমায়েতে কেন ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে দাঁড়ানো আমার দেশ ও নয়াদিগন্ত পোড়ানো হবে? কেন ভিন্নমত প্রকাশ করায় গণমাধ্যমকে হুমকি দেয়া হবে? দলীয় ব্যক্তির অপরাধে কেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হামলা করা হবে? ভিন্নমত পোষণ করলেই কেন তার নাগরিকত্ব বাতিলের দানবীয় হুমকি প্রদান করা হবে? কেন শাহবাগে অনুষ্ঠিত ইসলাম ও দেশীয় সংস্কৃতিবিরোধী কর্মকাণ্ডের খবর তুলে ধরায় একটি দৈনিকের সম্পাদকের শাস্তি, কারাদণ্ড ও মৃত্যু কামনা করা হবে? কেন রাজাকারের শাস্তি চাওয়ার নামে টুপি-দাড়িসহ সব ইসলামী পোশাককে হেয় করা হবে। ইসলাম চর্চাকারীদের চরিত্র হনন করা হবে? একটি ভালো কাজের ছুতোয় কি দশটি মন্দ কাজকে প্রশ্রয় দেয়া যায়? আজ যারা দেশপ্রেমে গদগদ হয়ে পথে নেমেছেন ফেলানীর লাশ যখন তিনদিন পর্যন্ত ভারতের কাঁটাতারে ঝুলেছিল তখন তারা কোথায় ছিলেন? পদ্মাসেতু, শেয়ারবাজার আর হলমার্কের কুমির-দস্যুদের অপরাধ দেখে তাদের দেশপ্রেম কেন জেগে উঠল না? ব্রাক হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষিতা হয়ে খুন হলে কেন তারা জাগলেন না? প্রতিদিন কত অসহায় নারী ধর্ষিতা ও খুন হচ্ছেন তাদের নির্যাতনে জড়িতদের বিচার চেয়ে কেন তারা পথে নামেন নি? মসজিদের মাইকে আযানের সুরে যারা রোগীদের কষ্টের কথা বলেন, তারা কেন বারডেম ও পিজি হাসপাতালের পাশে মাসের পর মাস এত চিৎকার-চেচামেচিতে রোগীদের কষ্ট অনুধাবন করেন না? মিডিয়া এদের পেছনে হাওয়া দিতে থাকায় অসহায় রোগী কিংবা হাসপাতাল দুটির চিকিৎসকরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সাহস পাচ্ছেন না।

নিরপরাধ মানুষকে যারা হত্যা করেছে, নিরীহ মা-বোনকে যে নরপশুরা ধর্ষণ করেছে তাদের মৃত্যুদণ্ড দাবি তো কুরআনেরই দাবি। কিন্তু এদের ফাঁসির দাবির সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবার পর শাহবাগে আর যা হচ্ছে একজন মুসলিম হিসেবে তার ক'টি কাজ আমরা সমর্থন করতে পারি? নাচ-গান, নারী-পুরুষের খোলামেলা ঘেঁষাঘেঁষি, মঞ্চে তরুণীদের উদ্বাহু নৃত্য কিংবা গলা ফাটানো গান ও শ্লোগান, মানুষের চেহারা বিকৃতি, প্রাণীর ছবি অঙ্কন ইত্যাদি- সবগুলোই ইসলামের দৃষ্টিতে চরম গর্হিত কাজ। কোনো মুসলিম এসব সমর্থন করতে পারেন না। প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির দাবি প্রতিটি মুসলিমেরই করা উচিত। কিন্তু এসবের কোনোটার সঙ্গে আল্লাহর প্রতি

বিশ্বাসী কেউ জড়িত হতে পারেন না। আন্দোলন থেকে যে কর্মসূচিগুলো ঘোষিত হচ্ছে তার মধ্যেও তো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কোনো ছাপ নেই। বিজাতীয় মোম প্রজ্বলন আর মৌনব্রত রীতি চর্চা কেন আমাদের প্রতিবাদের ভাষা হবে?! জাহানারা ইমামের প্রতিকৃতি স্থাপন আর তার সামনে খ্রিস্টীয় পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে কোন দুঃখে?!শাহবাগের আন্দোলন তার কুমারিত্ব হারিয়েছে। অবশ্য আন্দোলনের অনেক অগ্নিকন্যা তাদের মূল্যবান সে জিনিসটি হারিয়েছেন অনেক আগেই। বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে আড্ডা আর ঘনিষ্ট হবার এমন সুযোগ রাজধানীর কোন জুটিই বা লুফে নিতে চাইবে না। অদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁকা হলও অনেকের জন্য সুবর্ণ সুযোগ বয়ে এনেছে। আর সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা এবং বামদলগুলোর নেতৃত্বও এ আন্দোলনের সতীত্ব হরণ করেছে। প্রকাশ্যে সাপের মতো করে মানুষ হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের মঞ্চে অবস্থানও একে কলঙ্কিত করেছে। কাদিয়ানী ও রাজাকার নুরুল ইসলাম আজ দল বদলেছেন বলে তিনি হয়ে গেছেন স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোক! হায় পরিহাস, রাজাকার নুরুল ইসলামও এখন ফাঁসির দাবির মঞ্চে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন! বলি, বন্ধুরা আমাকে ক্ষমা করো। সম্ভব হলে আমার প্রশ্নগুলোর সত্যনিষ্ঠ উত্তর তালাশ করো।

সময় হয়েছে শাহবাগ তথা নাস্তিক্যবাদীদের সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার। শাহবাগে যা হচ্ছে তার ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করার। ইতোমধ্যে অবশ্য সে আওয়াজ ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিক থেকে উঠতেও শুরু করেছে। পত্রিকার ভাষ্য মতে, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকেও শাহবাগ উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারে থাকা প্রতাপশালী বাম নেতৃত্বের প্রভাবে তা হয়ে উঠছে না। এখনই যদি শুভ বোধসম্পন্ন লোকেরা এর ইতি-নেতি নিয়ে আওয়াজ না তোলেন তবে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ দেশের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব হুমকির পড়বে। বিপক্ষ মত দমন আর একদলীয় লেজুড়বৃত্তির ফ্যাসিবাদী মনোভাব প্রতিষ্ঠা পাবে। আজ আপনারা যদি কথা না বলেন, তবে কালকে এরা মুক্তিযোদ্ধা কোটার মতো শাহবাগ কোটা বরাদ্দের দাবি তুলবে সরকারি পদে। ইমাম সাহবেগণ যদি এর বিরুদ্ধে মুসল্লীদের সজাগ না করেন তবে এ দেশে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে। আপনার মিম্বারের বিরুদ্ধেও শ্লোগান উঠবে। আজ এরা ত- তে তুই রাজাকার বলতে বলতে ই- তে তুই ইসলাম তুই রাজাকারও বলে বসেছে!

দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ যখন এই নাস্তিক ব্লগারদের ঘৃষ্টতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার অপরিহার্য শর্ত পূরণে দগ্ধ হৃদয়ে পথে নেমে এদের শাস্তি দাবি করেন, তখন বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদপ্রভাবিত মিডিয়াগুলো এটাকে একটি দলের পক্ষের দালালি আন্দোলন বলে নির্জলা মিথ্যা প্রচারণা চালাতে থাকে। উপরন্তু মিডিয়াগুলো শাহবাগ ও নাস্তিকদের পক্ষে নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও হলুদ সাংবাদিকতা চালিয়ে যায়।

**© https://www.hadithbd.com

নাস্তিকতার অবাস্তব প্রস্তাবনা:

২০০ টি মার্বেল নিন। প্রতিটির গায়ে ১, ২, ৩... এভাবে একটি করে সংখ্যা লিখুন। একটা বড় টেবিল নিন। টেবিলে ২০০টি মার্বেল সাইযের গর্ত করুন। প্রতিটি গর্তের জন্য একটি করে সংখ্যা অ্যাসাইন করুন।

এখন আপনার কাছে ১-২০০ লেখা ২০০টি মার্বেল এবং টেবিলে ২০০টি গর্ত আছে। মার্বেলগুলোকে টেবিলে ছুড়ে দিন। প্রতিটি মার্বেলের কোন না কোন গর্তে পড়ার সম্ভাব্যতা কত? আর প্রতিটি মার্বেল গর্তে পড়বে এবং মার্বেলের গায়ে যে নাম্বারটি লেখা সেই নাম্বারের গর্তেই পড়বে (অর্থাৎ ১ লেখা মার্বেল পড়বে ১ লেখা গর্তে, ২ লেখা মার্বেল পড়বে ২ লেখা গর্তে – এভাবে ২০০ পর্যন্ত) – এর সম্ভাব্যতা কত?

আচ্ছা যদি আপনি ২০০ বার এই কাজটা করেন, অর্থাৎ মার্বেল ছুড়ে দেন, তাহলে দুইশবারই এই ভাবে সঠিক নাম্বারের গর্তে সঠিক নাম্বারের মার্বেল পড়ার সম্ভাব্যতা কত?

হিসেবটা করতে থাকুন। ততক্ষণে আসুন অবিশ্বাসের বিশ্বাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

হাবল টেলিস্কোপের ডেইটার ভিত্তিতে ধারণা করা হয় দৃশ্যমান মহাবিশ্বে (বা মহাবিশ্বের যতোটুকু আমরা দেখতে সক্ষম হয়েছি) গ্যালাক্সির সংখ্যা ২০০ বিলিয়ন। (যদিও সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা অনুযায়ী সংখ্যাটা আরো দশগুণ বেশি হতে পারে [1]) নাসার ভাষ্যমতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীতে গ্রহের সংখ্যা ১০০ বিলিয়ন। আর দৃশ্যমান মহাবিশ্বে গ্রহের সংখ্যা হল কারও মতে ১ অক্টিলিয়ন = ১ এর পর ২৭টি শূন্য, আর কারও মতে ১ সেপ্টিলিয়ন = ১ এর পর ২৪টি শূন্য । (তবে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীর সংখ্যা যদি ২০০ বিলিয়নের জায়গায় ২০০০ বিলিয়ন হয় তাহলে গ্রহের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।)

ষাটের দশকে ধারণা করা হত, কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার জন্য শুধু দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রয়োজনঃ

১) সঠিক ধরনের নক্ষত্র (star), এবং

২) সেই সঠিক ধরনের নক্ষত্র থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রহ।

সঠিক ধরনের নক্ষত্র বলার কারন হল যে কোন ধরনের নক্ষত্র হলেই তা প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। আর সঠিক দূরত্ব বলার কারন হল, প্রাণের জন্য গ্রহের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে। তাই যদি কোন গ্রহ, নক্ষত্রের খুব বেশি কাছে বা খুব বেশি দূরে হয় তাহলে সেই গ্রহের তাপমাত্রা প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। অর্থাৎ কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার জন্য এই দুটি চলকের (variable) নির্দিষ্ট (অথবা নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে) মান থাকা আবশ্যক।

এটা ছিল ষাটের দশকের ধারণা। অ্যাস্ট্রোনমার কার্ল স্যাইগান ১৯৬৬ প্রথম এই ধারনার কথা ঘোষণা করেন। স্যাইগান এবং তার রিসার্চ টিম হিসেব করে দেখেছিলেন এই দুটো প্যারামিটার অনুযায়ী মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের (Star) মধ্যে ০.০০১% নক্ষত্রের পক্ষে প্রাণের জন্য সহায়ক হওয়া সম্ভব। স্যাইগানের ভাষায় –

"মহাবিশ্বে গ্রহ আছে ১ অকটিলিয়নের মতো – অর্থাৎ একের পর ২৪টি শূন্য। সুতরাং প্রাণের জন্য সহায়ক গ্রহের সংখ্যা হওয়া উচিৎ ১ সেপটিলিয়নের মতো – অর্থাৎ ১ এর পর ২১টি শূন্য [2]।"

পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতকে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক এরকম আরো দুইশটি প্যারামিটার/চলক খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা । অর্থাৎ স্যাইগানের দাবিমতো ২টি নয়, বরং কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য ২০০টির মত চলকের সুনির্দিষ্ট মান থাকা আবশ্যক,।
এরকম কিছু প্যারামিটারের উদাহরণ দেওয়া যাক। যেকোন ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। গ্যালাক্সাটিকে একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি হতে হবে (যেমন মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি)। গ্যালাক্সিটিকে একটি নির্দিষ্ট আকারের হতে হবে, তার চাইতে বড় কিংবা ছোট হলে হবে না। গ্যালাক্সিটিকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের হতে হবে।

স্যাইগানের দুটো প্যারামিটারের সাথে শুধু এই নতুন প্যারামিটারগুলো বসাবার পরই হিসেব থেকে মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির প্রায় ৯০ শতাংশকে বাদ দিতে হয়।

এছাড়া শুধু নির্দিষ্ট ধরনের গ্যালাক্সিতে সঠিক ধরনের নক্ষত্র হলেই হবে না, সেই নক্ষত্রকে ঐ স্পাইরাল গ্যালাক্সির সঠিক অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে। নক্ষত্রের আকার একটি নির্দিষ্ট

রেইঞ্জের মধ্যে হতে হবে, তার ভর একটি নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে হতে হবে। শুধু তাই না, প্রাণের জন্য সহায়ক হতে গেলে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সৌরজগত লাগবে, নির্দিষ্ট ধরনের গ্রহ লাগবে, নির্দিষ্ট ধরনের উপগ্রহ লাগবে, ঐ গ্রহের আশেপাশের গ্রহগুলোকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে। এভাবে লিস্ট লম্বা হতেই থাকে।
এরকম আরো কিছু প্যারামিটারের জন্য দেখতে পারেন –

http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-on-earth-june-2004

http://www.konkyo.org/English/DoesLifeExistOnAnyOtherPlanetInTheUniverseAnotherLookAtSETI

মনে রাখবেন স্যাইগানের মাত্র দুটো প্যারামিটারের কারনে মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের (Star) মধ্যে প্রাণের জন্য সহায়ক হওয়া সম্ভব এমন নক্ষত্রের সংখ্যা নেমে এসেছিলে ০.০০১% -এ। দুশোটা প্যারামিটারের জন্য হিসেবটা কি হবে?

অ্যাস্ট্রোফিযিসিস্ট ডঃ হিউ রসের হিসেব অনুযায়ী ৩২টি প্যারামিটার জন্য, অর্থাৎ কোন একটি গ্রহের ৩২ টি প্যারামিটার পূর্ণ করার সম্ভাবনা হল ১/১ ট্রেডেকসিলিয়ন [১ ট্রেডেকসিলিয়ন = ১ এর পর ৪২টি শূন্য]।অবশ্যই ডঃ রসের হিসেব সম্পর্কে আপত্তি তোলা যেতে পারে। কারন কোন নির্দিষ্ট প্যারামিটারের জন্য তার এস্টিমেশানের হয়তো অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে মিলবে না। কিছু প্যারামিটারের ক্ষেত্রে হয়তো অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্যতার মানকে ভিন্ন ভাবে ধরবেন।
কিন্তু তাতেও এই সত্যটা বদলায় না যে এই মহাবিশ্বের কোন একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশের জন্য (জটিল ও বুদ্ধিমান প্রাণের কথা বাদই দিলাম) বিস্ময়কর ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন। কাকতালীয়ভাবে সঠিক সিকোয়েন্সে একের একের পর এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে এরকম একটি ফলাফল পাওয়া গেছে - যেকোন সাধারন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এটা বিশ্বাস করতে ভালো রকমের কষ্ট করতে হবে।

যতোই সময় যাচ্ছে, এলেমেলো বিস্ফোরণ এবং মহাবিশ্বের random বিবর্তনের বদলে বিজ্ঞানীর বরং মহাবিশ্বের মাঝে একটি ফাইন টিউনিং (fine tuning) লক্ষ্য করছেন। যার ফলে পৃথিবীতে জটিল ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র মহাবিশ্বের কোন একটি গ্রহের প্রাণের জন্য সহায়ক হবার জন্য প্রয়োজনীয় ফাইন টিউনিং সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইন টিউনিং এর গল্পটা আরো অনেক, অনেক বিস্ময়কর। কিন্তু সেটা আরেক দিনের জন্য তোলা থাক।

বলা যায় একজন মানুষকে একটা বিশেষ ধরনের ইন্ডক্ট্রিনেশানের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সাধারন বিবেচনাবোধকে উপেক্ষা করে এমন অতিপ্রাকৃত এবং সত্যি কথা বলতে, অলৌকিক একের পর এক দুর্ঘটনা randomly ঘটেছে এমনটা বিশ্বাস করার জন্য।

আর নাস্তিকতার প্রস্তাবনা ঠিক এটাই। তাদের বক্তব্য হল একের পর এক সুনির্দিষ্ট দুর্ঘটনার ফলে দৈবক্রমে এই সুনির্দিষ্ট ফলাফল এসেছে।

আমাদের প্রথম প্রশ্নে ফেরত যাওয়া যাক। এই উদাহরনের ক্ষেত্রে যদি আমি আপনাকে বলি দুইশো বার মার্বেল ছুড়ে দেবার পর দুইশোবারই সঠিক নাম্বারের গর্তে সঠিক নাম্বারের মার্বেল পড়বে, এবং এটাই স্বাভাবিক- তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

অবশ্যই না। কারন স্বাভাবিক ভাবে কখনোই এমনটা ঘটে না। আমরা – অর্থাৎ মানবজাতি- কখনোই এমনটা ঘটতে দেখি না, দেখি নি।

যদি আপনি সায়েন্টিফিক মেথডের কথা চিন্তা করেন তাহলে প্রথমে পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে হাইপোথিসিস তৈরি করা হবে। আর তারপর সেই হাইপোথিসিসকে পরীক্ষা (Experiment) করতে হবে । কোন হাইপোথিসিস বা ধারণার সত্য হবার জন্য অবশ্যই পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণীয় উপাত্তকে (Observable Data) আপনার হাইপোথিসিসের সাথে ম্যাচ করতে হবে, এবং এই পরীক্ষাকে পুনরাবৃত্তি করে একই ফলাফল আনতে পারতে হবে (results of the experiment must be repeatable)।

এখন চিন্তা করে দেখুন দৈবক্রমে একের পর এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে ফাইন টিউনড মহাবিশ্বে একটি ফাইন টিউনড গ্রহে জটিল ও বুদ্ধিমান প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত হাইপোথিসিস বা ধারণা কি আমাদের পর্বেক্ষনীয় উপাত্ত বা Observable Data দ্বারা সমর্থিত? এই হাইপোথিসিস কি আদৌ পরীক্ষা করা সম্ভব? কোন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে সত্যায়ন করা সম্ভব? সেই পরীক্ষার ফলাফলের কি পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব?
পরিষ্কারভাবেই নিছক দুর্ঘটনাবশত এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং একের পর এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে by chance প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাপারে নাস্তিকদের প্রস্তাবনা এই প্রস্তাবনা একটি হাইপোথিসিস ছাড়া আর কিছুই না। এবং বেশ দুর্বল হাইপোথিসিস। কিন্তু নাস্তিকরা এই দুর্বল হাইপোথিসিসকে বাস্তব সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে। যদিও তাদের এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, এবং সাধারণ বিবেচনাবোধের সাথে এই বিশ্বাস সাংঘর্ষিক।
শুধু তাই না তারা এই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মত বলেও প্রচার করে, এবং তাদের এই অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বুদ্ধিবৃত্তির শিখর মনে করে আত্মবিভ্রমে ভোগেন।

আর যখন তাদেরকে বলা হয় তাদের এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করার তখন তারা কেন অন্যদের বিশ্বাস ভুল তা প্রমানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এক কথায় এটাই নাস্তিকতার সবচেয়ে বড় এবং সফল বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই।

তারা সফলভাবে অন্য বিশ্বাসগুলোকে আক্রমণ করার মাধ্যমে তাদের নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, এবং নিজেদের অযৌক্তিক এবং ম্যাজিকাল বিলিফ সিস্টেমকে যৌক্তিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার পোশাক পড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। আর এটা করতে তারা সক্ষম হয়েছে নিজ ধর্মের প্রতি ধর্ম বিশ্বাসীদের রক্ষণাত্মক মনোভাবের কারনে।

যদি আমি দাবি করি আমি সঠিক তাহলে বাকি সবাইকে ভুল প্রমাণ করা আমার পক্ষে প্রমাণ না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার দাবির পক্ষে অকাট্য প্রমাণ না আনতে পারছি ততক্ষণ আমার দাবি সঠিক প্রমাণিত হয় না। যদিও অন্য সবার দাবি ভুল হয়।

আস্তিকদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিৎ যে নাস্তিকদের আবশ্যক দায়িত্ব তাদের প্রস্তাবনাকে সত্য প্রমাণ করা। বিশ্বাসীদের দায়িত্ব না তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে নাস্তিকদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া। নাস্তিকরা নিত্যনতুন নকশা করবে আর বিশ্বাসীরা মনযোগ দিয়ে, সময় ব্যয় করে তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা, লজিকাল ফ্যালাসি, লিঙ্গুইস্টিক প্যারাডক্সের উত্তর দেবে - এটার কোন মানেই হয় না।

যদি নাস্তিকরা আসলেই তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে সিরিয়াস হয় তাহলে অবশ্যই তাদেরকে তাদের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। যদি তারা তা না পারে তাহলে তাদেরকে অক্ষমতা স্বীকার করে নিতে হবে। যদি তারা কোনটাই না করে এবং জোর করে নিজেদের অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, ম্যাজিকাল বিলিফ সিস্টেমকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায় তাহলে তাদের বালকসুলভ ন্যুইসেন্সকে, ন্যুইসেন্স হিসেবেই গণ্য করা হবে।

আর তাই নাস্তিকদের আমরা বলি – যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ উপস্থিত কর।

তথ্যসূত্রঃ

[1] https://www.spacetelescope.org/news...

[2] স্যাইগান ভুল করেছেন। ১ অক্টলিয়ন = ১ এর পর ২৭টি শূন্য, ১ সেপ্টিলিয়ন = ১ এর পর ২৪টি শূন্য, ১ সেক্সটিলিয়ন = ১ এর পর ২১টি শূন্য।

লিখেছেন: আবু সাফিয়া

©https://www.response-to-anti-islam.com/

অপ্রমাণ্য নাস্তিকতা

১.

নন-প্র্যাকটিসিং ইহুদি পরিবারে জন্ম নেওয়া হাঙ্গেরিয়ান-অ্যামেরিকান পলিম্যাথ জন ভন নিউম্যান ছিলেন একজন অ্যাগনস্টিক। কিন্তু প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে ভুগতে থাকা ভন নিউম্যান মৃত্যুর কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নেন একজন ক্যাথলিক পাদ্রিকে ডেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করার। স্বাভাবিকভাবেই ভন নিউম্যানের সিদ্ধান্ত তার পরিবার ও বন্ধুদের অবাক করে। আজীবন লালিত অজ্ঞেয়বাদকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসকে গ্রহন করার কারন সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে ভন নিউম্যান জবাব দেন – Pascal had a point ["প্যাসকেলের কথায় যুক্তি ছিল।"]

ভন নিউম্যান এখানে ফরাসী গণিতবিদ, দার্শনিক এবং পদার্থবিজ্ঞানী ব্লেইয প্যাসকালের বিখ্যাত "বাজির" কথা বলছেন। Pascal's Wager নামে খ্যাত এই যুক্তির মূল বক্তব্য হল-

যেহেতু কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব নিশ্চিত ভাবে প্রমান করা সম্ভব না, তাই স্রষ্টায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ এক অর্থে একটি বাজিতে অংশগ্রহন করে। কেউ বেছে নেবে স্রষ্টা আছেন। কেউ বেছে নেবে স্রষ্টা নেই। গাণিতিক ভাবে এক্ষেত্রে যেকোন মানুষের সঠিক বা ভুল হবার সম্ভাবনা হল ১/২।

ব্যাপারটা অনেকটা কয়েন দিয়ে টস করার মতো। হেড বা টেইলস (আমরা ক্রিকেট খেলার সময় বলতাম "শাপলা" আর "ফলমূল") আপনি কয়েনের যেকোন একটি দিক বেছে নেবেন। আপনার জেতার সম্ভাবনা থাকবে ১/২।
এখন দেখা যাক সম্ভাব্য এই দুটি ফলাফলের ক্ষেত্রে লাভ ও ক্ষতি কি রকম -

স্রষ্টা আছেনঃ বিশ্বাসীরা দুনিয়াতে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কারনে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ তাদের কিছু পরিমাণ আনন্দ, বিনোদন এবং সুখ পরিত্যাগ দিতে হবে। এটাকে আমরা ক্ষতি হিসেবে ধরবো। তবে যেহেতু আমরা জানি দুনিয়ার জীবন সীমিত। তাই বিশ্বাসীদের এই ক্ষতি হবে সীমিত। আর এই সীমিত ক্ষতির পরিবর্তে বিশ্বাসীর মৃত্যুর পর পাবে অসীম সময় ধরে পুরস্কার। যেহেতু আখিরাতের জীবন অসীম।
অন্যদিকে অবিশ্বাসী দুনিয়াতে স্রষ্টার বাধানিষেধ না মেনে ইচ্ছেমতো যেকোন কিছু করার কারনে সীমিত পরিমাণ লাভ পাবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাকে অসীম সময় ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অর্থাৎ যদি স্রষ্টা থাকেন, তাহলে সীমিত ক্ষতির বিনিময়ে বিশ্বাসী পাবে অসীম লাভ। আর সীমিত লাভের বিনিময়ে অবিশ্বাসী পাবে অসীম ক্ষতি।

স্রষ্টা নেইঃ যেহেতু মৃত্যুর পর আর কোন কিছু নেই এবং দুনিয়ার জীবনই সব তাই আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কারনে বিশ্বাসীদের দুনিয়ার সীমিত জীবনে সীমিত পরিমাণ ক্ষতি হবে। আর বাধানিষেধ না মেনে ইচ্ছেমতো যেকোন কিছু করার কারনে দুনিয়ার জীবনে অবিশ্বাসীরা সীমিত পরিমাণ লাভ করবে।

সুতরাং একজন বিশ্বাসীর জন্য এই বাজিতে সম্ভাব্য ফলাফলের সেট দুটো – (সীমিত সময় জুড়ে ক্ষতি, তারপর অসীম সময় জুড়ে পুরস্কার) অথবা (সীমিত সময় জুড়ে ক্ষতি, তারপর শুন্যতা)।

একজন অবিশ্বাসীর জন্যও সম্ভাব্য ফলাফল দুটো – (সীমিত সময় জুড়ে লাভ, তারপর অসীম সময় জুড়ে শাস্তি) অথবা (সীমিত সময় জুড়ে লাভ, তারপর শুন্যতা)।

সুতরাং যদি স্রষ্টা না থাকে তাহলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী দুজনের জন্যই মৃত্যুর পর ফলাফল এক। শুন্যতা। কিন্তু যদি স্রষ্টা থাকেন তাহলে বিশ্বাসীর পুরস্কার অসীম, অন্যদিকে অবিশ্বাসীর শাস্তি অসীম। তাই বাজি বা কয়েন টসের সময় একজন বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারবে তাকে মূলত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সীমিত আর অসীমের মধ্যে।

প্যাসকেলের বক্তব্য হল সীমিত লাভের সম্ভাবনার জন্য অসীম সময়জুড়ে শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া অযৌক্তিক। এ কারনে সম্ভাব্য ফলাফলের বিবেচনায় গাণিতিক ও যৌক্তিকভাবে "স্রষ্টা আছেন" এই অবস্থান নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ।

প্যাসকেলের প্রায় ৬০০ বছর আগে মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ জিয়াউদ্দিন আব্দুল মালিক আল-জুয়াইনি একই ধরনের যুক্তির ব্যবহার করেছিলেন।

এছাড়া আমাদের দেশের ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা শোনা যায় যেখানে মূলত এই যুক্তিরই একটি ব্যবহৃত হয়েছে।

একজন নাস্তিক ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে প্রশ্ন করলোঃ আপনি যে অতো ধর্ম-কর্ম করেন এতো বিধিনিষেধ মানেন। যদি মরার পর দেখেন আল্লাহ নাই, তাহলে কেমন হবে? এসবই কি তাহলে লস না?

ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ জবাবে বললেনঃ যদি তুমি মরার পর দেখো আল্লাহ আছেন তাহলে তোমার যা হবে তার তুলনায় আমার লস কিছু না।

তাই প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত ভন নিউম্যান ঠিক কোন অবস্থান থেকে বলেছিলেন – Pascal had a point - তা বোধগম্য। একজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে একটি ওষুধের কথা বলা হলো যেটা খেলে ৫০% সম্ভাবনা হল মারা যাবার আর ৫০% সম্ভাবনা হল সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভের। এক্ষেত্রে ওষুধটি খেলে রোগীটির হারানো কিছু থাকে না কিন্তু পাবার সব কিছুই থাকে। এই সহজ সমীকরণ ভন নিউম্যানের মিস করার কথা না।

প্যাসকেলের বাজি স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি না। তবে নিঃসন্দেহে নাস্তিকরা বিশ্বাসীদের অবস্থানকে অযৌক্তিক বলে যে দাবি করে তার বিরুদ্ধে সহজবোধ্য এবং শক্তিশালী জবাব। আর একই সাথে নাস্তিকতার অবস্থানের যৌক্তিকতার ব্যাপারেও একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

২.

১৯৫৩ সালে Look ম্যাগাযিনের একটি সাক্ষাৎকারে বিখ্যাত নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল – ঠিক কি ধরনের প্রমান পেলে আপনি বিশ্বাস করবেন স্রষ্টা আছেন?

জবাবে রাসেল বলেছিলঃ যদি আমি আকাশ থেকে স্রষ্টার গায়েবি কন্ঠ শুনতে পাই, আর যদি এই কন্ঠ আগামী ২৪ ঘন্টায় আমার সাথে কি কি ঘটবে তা হুবহু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে। তাহলে আমি বিশ্বাস করবো স্রষ্টা আছেন।

বলাবাহুল্য আস্তিক বা নাস্তিক কেউই বিশ্বাস করে না যে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে স্রষ্টা এই ভাবে কথোপকথন করবেন এবং স্বীয় অস্তিত্বের প্রমান দেবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার মুশরিকদের কাছে তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখনো তাদের অনেকেই রাসেলের মতোই দাবি করেছিল।

“কেন একজন ফেরেশতা আমাদের চোখের সামনে আসমান থেকে নেমে আসে না?” “কেন আমাদের চোখের সামনে আসমান থেকে একটি কিতাব নেমে আসে না?” “কেন তোমার রব আসমান থেকে একটি সিঁড়ি নামিয়ে দেন না, আর তুমি সেই সিঁড়ি দিয়ে আসমানে উঠে যাও না?” ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে এটা অবিশ্বাসীদের অবস্থানের ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়। যদিও অনেক কিছুই তারা চাক্ষুস প্রমান ছাড়াই বিশ্বাস করে, কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রে তারা চাক্ষুস প্রমান চায়। মিরাকল বা কেরামতপূর্ণ ঘটনা দেখতে চায়। এক্ষেত্রে আরো একটি কথাও বলা যায়। যদি নাস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এতো মোটা দাগের প্রমান দাবি করে, তাহলে ইনসাফ হল স্রষ্টার অনস্তিত্বের ব্যাপারের তাদের দাবি প্রমান করার জন্য তারা একই ধরনের মোটা দাগের কোন

প্রমান উপস্থাপন আবশ্যক। যদিও অতি সুক্ষ দাগের কোন ইতিবাচক প্রমানও (Positive proof) নাস্তিকরা আজো উপস্থাপন করতে পারে নি।

৩.

ভন নিউম্যান এবং রাসেলের এ দুটো ঘটনা থেকে মূলত যা প্রমান হয় তা হল শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার ব্যাপারে অবস্থান - সেটা আস্তিকতা হোক বা নাস্তিকতা হোক – একটা দার্শনিক বা দর্শনগত অবস্থান। এটা কোন বৈজ্ঞানিক অবস্থান না। কারন আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব প্রমান করা সম্ভব না। একজন মানুষ এই দুটো অবস্থানের কোনটি গ্রহন করছে সেটা থেকে বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান সম্পর্কেও (পার্থিব বিচারে) কোন ধারণা করা যায় না।

ভন নিউম্যান, কিংবা প্যাসকেল নিশ্চিত ভাবেই অশিক্ষিত, মূর্খ ব্যক্তি ছিলেন না। তারা যুক্তি, বিজ্ঞান বুঝতেন না এমন দাবি করার চিন্তা করাটাও হাস্যকর। অন্যদিকে ম্যাথমেটিশিয়ান এবং দার্শনিক রাসেলকেও পার্থিব বিচারের মূর্খ আহাম্মক বলা যায় না।

স্রষ্টায় বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিজ বিচার, বিবেচনা ও বোধবুদ্ধির আলোকে। আর আধুনিক মিলিট্যান্ট বা নিউ অ্যাইথিস্টরা যতোই চিৎকার চেচামেচি করুক না কেন বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম না। সুতরাং যারাই শুধুমাত্র বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আস্তিকতা কিংবা নাস্তিকতাকে সঠিক প্রমান করতে চান তারা দুইদলই একটি মৌলিক ভুল করেন। বিজ্ঞান শুধু কিছু পর্যবেক্ষণকে আপনার সামনে তুলে ধরতে পারে যা স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্বের প্রশ্নের ব্যাপারে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ। আস্তিক আর নাস্তিকরা এই পর্যবেক্ষনগুলোকে নিজ অবস্থানের পক্ষে ব্যবহার করে। কিন্তু তারা যে উপসংহার উপস্থাপন করে তা তাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা; বিজ্ঞান না।

নাস্তিকরা এই ভুলটা অনেক সময়ই ইচ্ছাকৃতভাবেই করে, কারন দর্শনের দিক থেকে নাস্তিকতার দাবি প্রমানের ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক প্রমান বা যুক্তি উপস্থাপন করতে দশকের পর দশক ধরে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদের জন্য বিজ্ঞানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা, বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করাটাই লাভজনক।

আর আস্তিকদের একটা বড় অংশ একই ভুল করে নাস্তিকদের এই আপাত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। নাস্তিকদের জবাব দেয়ার জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার করা থেকে শুরু হলেও অনেকেই এই অবস্থানে চলে যান যেখানে তারা বিশ্বাসকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করেন। আর এটিও বিশ্বাস এবং যুক্তি – উভয় দৃষ্টিকোন থেকেই ভুল।

৪.

তাহলে উপায় কি? এই বিতর্কের মীমাংসা হবে কি করে?
একজন মুসলিম আপনাকে বলবে এর মীমাংসা হবে মৃত্যুর পর।

"...অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; তখন আমি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ" [আলে ইমরান, ৫৫]

কিন্তু একজন নাস্তিক কি বলবে? বার্ট্রান্ড রাসেল কিংবা মক্কার কুরাইশরা যেরকমের মিরাকল দাবি করেছে সেগুলোর অবর্তমানে নাস্তিকতার দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে, শুধু একটি জিনিসই এ বিতর্কের মীমাংসা করতে পারে। আর তা হল মৃত্যু পরবর্তী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমান, যাকে অনেকে এস্ক্যাটোলজিকাল ভেরিফিকেশান (Eschatological Verification) বলে থাকেন।

সেক্ষেত্রে যদি মৃত্যু পরবর্তী সম্ভাবনা হয়ঃ
১) স্রষ্টা তথা পরকাল/আখিরাত এবং
২) কোন চেতনা, কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকা; শুন্যতা (Oblivion),

তাহলে যদি #১ সত্য হয় তাহলে বিশ্বাসীরা সঠিক প্রমাণিত হবে। আর যদি #২ সত্য হয় তাহলে নাস্তিকরা সঠিক প্রমাণিত হবে।

মজার ব্যাপারটা হল যদি সম্ভাব্য ফলাফল এই দুটোই হয় তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবে যা বলতে পারি তা হলঃ

১) বিশ্বাসীরা যদি ভুলও হয় তবুও তারা কখনোই জানতে পারবে না যে তারা ভুল।

২) নাস্তিকরা যদি ঠিকও হয় তবুও তারা কখনোই জানতে পারবে না যে তারা ঠিক। [১]

সুতরাং বিজ্ঞানের দিক থেকে এবং দর্শনের দিক থেকে নাস্তিকতাকে প্রমান করা অথবা ভেরিফাই করা অসম্ভব। আমাদের দেশীয় অধিকাংশ নাস্তিক - যারা মুক্তমনা জাতীয় ব্লগ, আরজ আলী মাতব্বর-হুমায়ুন আজাদের বই পড়ে এবং ডকিন্স-ক্রাউস-হ্যারিসদের বই/ভিডিও থেকে ধরাবাঁধা যুক্তি মুখস্থ করে বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, ডোমের মতো গালাগালি, আর লজিকাল ফ্যালাসির ভঙ্গুর প্রাসাদ বানানো আর বেশি থেকে বেশি হলে লিঙ্গুইস্টিক প্যারাডক্স আওড়ানোকে ইসলামের "মুখোশ উন্মোচন" জাতীয়

কিছু একটা মনে করে - এই সত্যটা তারা হয়তো ধরতে পারবে না। যেহেতু অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করার চাইতে গালাগালি, সস্তা রসিকতা এবং যেকোন মূল্যে তর্কে জেতাই তাদের মূল আগ্রহ।

তবুও নাস্তিকতার দৃষ্টিকোন থেকেই এতোশত বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই আর বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করার পর, দিন শেষে একজন নাস্তিক শেষপর্যন্ত কখনোই তার বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না - এটা জানাটা আশ্চর্য রকমের তৃপ্তিদায়ক।

***© https://response-to-anti-islam.com/

নাস্তিক্যবাদীদের ভণ্ডামি

সত্য কথা বললেই যদি হাজী সাহেবের মুখ খারাপ বলা হয় তাহলে তারা আবার কিভাবে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী দাবি করেন? তারা কীভাবে পরমত সহিষ্ণুতার পাঠ দেন? বিপক্ষ মত সহ্য করার কথা বলেন? কীভাবে তারা অন্যদের উগ্রবাদী আর মৌলবাদী বলেন? খোদ তারাই কি প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তি নন? তারা আজ তাদের পুরনো যত আদর্শিক শত্রু রয়েছে, সবাইকে এই আন্দোলনের মাধ্যমে ঘায়েল করতে চাইছে। কাউকে এর বিপক্ষে কোনো যৌক্তিক প্রশ্নও তুলতে দিচ্ছে না। গণদাবির চেয়ে গোষ্ঠী ও শ্রেণীগত দাবিই বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। এই হলো নাস্তিকদের প্রকৃত সততা।

নাস্তিকরা তাদের রাজনৈতিক গুরুর বিরুদ্ধে বললে স্বাধীন মত প্রকাশের কথা বলেন না, অথচ শত কোটি মানুষের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব, সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বোধ কিংবা বিবেকহীন সমালোচনা করা হলে, তাঁর বিরুদ্ধে অশালীন কটূক্তি করা হলে দোহাই দেয়া হয় এই মত প্রকাশের স্বাধীনতার! নেতার সমালোচনা করায় তৎক্ষণাত চাকরি হারায়, দিন না পেরোতেই জেলে বন্দি করা হয় অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা এবং ইসলামকে তীব্র কটাক্ষকারী উন্মাদ ব্লগারদের রাষ্ট্র দেয় নিরাপত্তার জন্য গানম্যান! নাস্তিকদের ভণ্ডামি আর দ্বিমুখী নীতির দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারীরা ইন্টারনেট ব্লগগুলোয় যে ভাষা ও ভঙ্গি প্রচার করে বেড়ান, তা তাদের অন্তরালের জীবনের মতোই ঘৃণ্য। অকল্পনীয় অশ্লীল এবং অসহনীয় মিথ্যায় ভরা। অথচ এ দেশের বাম-নাস্তিক অধ্যুষিত মিডিয়াগুলো বরাবর তাদেরই পক্ষ নিয়ে এসেছে। এও এক দ্বিচারিতা। আবার এদের ভণ্ডামি আর মুখোশ উন্মোচনের উদ্যোগ নেয়ায় বামনিয়ন্ত্রিত সরকারও এমন উদ্যোগ নেয় যা শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভণ্ডামির অন্যতম। ইসলামপন্থী মিডিয়ায় নাস্তিক ব্লগারদের ইসলাম ও রাসূল অবমাননার সংবাদ প্রকাশ হলে যখন সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে

পড়ে তখন তাদের বিরুদ্ধে নামকাওয়াস্তে ব্যবস্থা নিয়ে এসব প্রচার বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হয়! আর 'উস্কানি' ও 'ধর্মাবননা'র অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় অন্যায় মানুষের সামনে তুলে ধরা মাহমুদুর রহমানকে। রাসূলকে কটুক্তি করা অপরাধ নয়; কটুক্তির সংবাদ প্রচার করা অপরাধ। কী বিচিত্র মুসলিম দেশ! হায় সেলুকাস!

©https://www.hadithbd.com

নাস্তিকরা কেন ইসলাম বিদ্বেষী? অন্য ধর্ম কেন নয়?

বেশিরভাগ মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে শ্রেফ নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এজন্য ।

তাহলে সেটা আবার কেমন স্বার্থ, যার কারনে ইসলামের বিরুধীতা!

ধরুন, ইসলাম বলে সুদমুক্তির কথা। মানে ইসলামে সুদ হারাম। এখন ঐ শ্রেণিটার ইসলাম ভালো লাগেনা বা সেই সকল লোক ইসলামের বিরুদ্ধে বলবে যাদের হাতে পুঞ্জিভূত পৃথিবীর ৫০% সম্পদ, যা আরো বাড়ছে সুদের দ্বারা।

ধরুন, ইসলাম বলে জবাবদিহি রাষ্ট্র পরিচালনার কথা। এখন দুর্নীতিবাজ শাসকরা জবাবদিহিতার ভয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঙুল তুলবে। স্বাভাবিক।

ইসলাম বলে প্রকৃত ন্যায় কিংবা স্বচ্ছ বিচার বিভাগের কথা, যেখানে কারো সাধ্য নেই ন্যায়কে পাশ কাটানোর। যেখানে বিচারক স্বাধীনভাবে রায় দিতে পারবে। সেটা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে গেলেও। এইজন্যেই অপরাধপ্রবণ প্রশাসক কিংবা নীতিনির্ধারকদের ইসলাম ভাল্লাগবেনা, যারা অপরাধ করে পার পেতে চায় কিংবা পার পাইয়ে দিতে চায়।

ইসলাম যখন সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা নিষেধ করে তখন ঐসকল বিকৃতমনাদের টনক নড়ে যারা আর্ট-মিডিয়া-সিনেমা কিংবা বিভিন্ন উৎসবের নামে শ্রেফ নারীকে ভোগ্যপন্য বানিয়ে ভোগ করে।

যখন নারীপুরুষ আলাদা আলাদা শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র আর পর্দার কথা বলে, তখন সেই সকল লোকদের ইসলাম ভাল্লাগবেনা যারা মেয়ে দেখলেই "মা*ল" বলে সম্বোধন করে। যারা শেয়ালরূপী জানোয়ারেরমত বসে থাকে মুরগী ভোগ করার জন্য।.

ইসলাম চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ঘুষ-হারাম করেছে বলেই, সেই সকল রাজনীতিবীদ কিবা অফিসারদের ইসলাম ভাল্লাগবেনা(!) যারা কিনা এইসব তাদের অধিকার মনে করে।.

পৃথিবীর সকল ধর্মই মূল্যবোধ, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় উৎসব,জীবন-মরন নিয়ে কথা বলে। কিন্তু একমাত্র ইসলাম'ই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে এর বাহিরেও অর্থব্যবস্থা-রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।.

ইসলাম কথা বলে আলাদা এক সমাজ ব্যবস্থার জন্য।

যেখানে সম্রাটের নিযুক্ত বিচারক রায় দেবে সম্রাটের বিরুদ্ধেই।

যেখানে একটা নারী শালীনতা বজায় রেখে সব করতে পারবে, কোনো পুরুষের সাহস হবেনা, চোখ তুলে তাকাবার।

যেখানে দারিদ্রসীমার অবস্থা এমন হবে যে, যাকাত নেওয়ার জন্য খুঁজে খুঁজে লোক পাওয়া যাবেনা।.

এইজন্যেই যারা সমাজে ন্যায়বিচার চায় না, চায় অপরাধ করে পার পেতে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে দরিদ্র রেখে অল্পতে শ্রম কিনে টাকার পাহাড় গড়তে, নেশা করতে, ব্যাবিচার করে, দুর্নীতি করতে, চায় নারীকে অবাদে ভোগ করতে- তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে লাগে(!) কথা বলে, আঙ্গুল তোলে।

***© Quora ওয়েবসাইটে খালেদ বিন মুসা মন্তব্য তুলে ধরা হইছে।

নাস্তিক্যবাদ এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন

একজন মুসলিমের কাছে জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কোনো প্রকার স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না যারা, তাদের জীবনের লক্ষ্য কী? উদ্দেশ্য কী? বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদীকে আপনি বলতে শুনবেন যেঃ "আমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের জীবনের অর্থ তৈরি করে নিতে হবে"। কিন্তু তাদের এই মতাদর্শের মাঝে বড়সর সমস্যা আছে। যেমন ধরুন, তারা মনে করে যে এই মহাবিশ্ব আসলে "প্রকৃতির খেয়ালে" হয়েছে। এই মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সিসমূহ, সৌরজগত,

পৃথিবী, এর প্রাণের বিকাশ এই সব কিছু কোনো বুদ্ধিমান সত্ত্বার আদেশ ব্যতিত এমনিতেই বহুকাল ধরে ধাপে ধাপে হয়েছে। এর পেছনে কোনো 'উদ্দেশ্য' নেই। তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী পৃথিবী ও এর মাঝের সবকিছুই "নাক্ষত্রিক ধূলিকণা" এবং এরপর "ক্রমাগত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল" ছাড়া কিছুই না। আর এক সময় এর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, একবার ধ্বংস হবার পরে আর কোনো জীবন নেই।

তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে কে কী বিশ্বাস করলো বা কে কী করলো এতে তো কিছুই আসে যায় না। কেউ নাৎসিবাদে বিশ্বাস করুক, কেউ লিবারেলিজমে বিশ্বাস করুক, কেউ কমিউনিজমে বিশ্বাসী হোক বা ইসলামে বিশ্বাসী হোক - এরা সবাই আসলে "প্রকৃতির খেয়ালে" দুনিয়ায় এসেছে, আর সবাই একই পরিণতির শিকার হবে। আর তা হলোঃ চির ধ্বংস। তাহলে কে কী জিনিসে বিশ্বাস করলো আর কেমন কর্ম করলো এতে কি কিছু আসে যায়? সবাই তো "নাক্ষত্রিক ধূলিকণা" থেকে 'দুর্ঘটনাক্রমে" জীবন লাভ করেছে। এরপর এক সময় তো ধ্বংসই হয়ে যাবে।

নিরিশ্বরবাদী বিবর্তনবাদীরা মনে করে, আমাদেরকে কেউ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করেনি। অর্থাৎ আমাদের এই জীবনের কোনো 'উদ্দেশ্য' নেই। এই বিষয়গুলো নিয়ে হতাশার জন্যই কি নাস্তিকরা অনবরত ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মকে আক্রমণ করতে থাকে? নাস্তিকদের বিভিন্ন ব্লগে ও লাইভে দেখবেন তারা বিভিন্ন ধর্মকে (বিশেষত ইসলামকে) অনবরত আক্রমণ করে অসার প্রমাণের চেষ্টা করে। তারা ইসলামের বিভিন্ন দিককে উল্লেখ করে এগুলোকে 'মধ্যযুগীয়', 'বর্বর' বলে দাবি করে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো যে খারাপ বা বর্বর - এর প্রমাণ কী? কিসের ভিত্তিতে ইসলামের এই দিকগুলো খারাপ বা বর্বর? কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে? একজন মুসলিমের কাছে মানদণ্ড হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী যা ভালো, মুসলিমদের কাছেও তা ভালো। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী যা খারাপ, একজন মুসলিমের কাছেও তা খারাপ। সব সময়ে এই একই মানদণ্ড। কিন্তু নিরিশ্বরবাদীদের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সময়ে সময়ে তাদের মানদণ্ড বদলে যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে কিছু লিবারেল দার্শনিক যেসব মতবাদ দিয়েছেন [যেমনঃ জীবনে সর্বোচ্চ সুখী হওয়া, কারো ক্ষতি না করা, সমতা] এগুলোর আলোকেই এখনকার সেকুলার-লিবারেল নাস্তিকরা কারো "সভ্য" হওয়া নির্ধারণ করে। কমিউনিস্ট নাস্তিকরা আবার মার্ক্সবাদ ও কমিউনিস্ট আদর্শের আলোকে তাদের এক্সটিভিজম চালায়। কিন্তু এইসব নীতিমালা অন্যরা কেন মেনে নেবে? এগুলো যে 'সত্য', এর প্রমাণ কী? লিবারেল বা অন্য কোনো আদর্শের দার্শনিকদের ধারণা অনুসরণ করে একজন মুসলিমকে কেন 'সভ্য' হতে হবে?

নাস্তিক্যবাদীরা এর জবাবে বলার চেষ্টা করেনঃ প্রাচীনকাল থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এইসব নৈতিকতা, সভ্যতা ইত্যাদির বোধ অর্জন করেছি। আমরা জানি অন্যের উপকার করা 'ভালো', ক্ষুধার্থকে খাবার দেয়া ভালো কাজ, রক্ত দান করা ভালো কাজ। কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে।

প্রথমত,

তাদের নিজেদের কথা অনুযায়ী এগুলো বিবর্তনের ফল। বিবর্তন কি 'নৈতিকতা' শেখায় নাকি এতে শুধু যোগ্যতররা টিকে থাকে? ধরুন, একটা শক্তিশালী গোত্র আরেকটা দুর্বল গোত্রকে মেরে ফেলে তাদের সর্বস্ব লুটে নিলো। বিবর্তনের আলোকে এটা কি "ভুল"? বিবর্তনের আলোকে আপনি 'সঠিক' বা 'ভুল' এর ধারণা কিভাবে পাবেন? ন্যায় বা অন্যায়ের ধারণা কিভাবে পাবেন?

দ্বিতীয়ত,

একেকজনের নিকট নৈতিকতার ধারণা একেক রকম হতে পারে। এই বিভিন্ন ব্যক্তিও [নিরিশ্বরবাদী বিবর্তনবাদীদের মতে] বিবর্তনেরই ফসল। রবিন হুডের কাছে মনে হতে পারেঃ ধনীদের লুট করে দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া "ভালো কাজ"। প্রিন্স জনের কাছে এই একই কাজ 'সন্ত্রাসবাদ' গণ্য হতে পারে। এখানে কে 'ঠিক' আর কে 'ভুল'?

হিটলারের কাছে ইহুদিদের গণহত্যা করা আর "আর্য জাতি" জার্মানদের আধিপত্য বিস্তার করা 'সঠিক কাজ'। আবার মিত্রবাহিনীর কাছে এই একই কাজ ছিল 'বর্বরতা'। যারা হিটলারের কাজকে 'বর্বরতা' বলে, তারাই আবার পৃথিবীতে মানবজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, মানবজাতির কল্যাণের জন্য অনেক প্রাণীকে গিনিপিগ বানিয়ে কেটে ছিড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। মানুষের ভক্ষণের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ 'হত্যা'কে তারা 'বর্বরতা' মনে করে না। শুধু জার্মানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা যদি 'বর্ণবাদ' হয় বা 'বর্বরতা' হয়, তাহলে সম্পূর্ণ 'মানবজাতির' আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কেন 'বর্বরতা' হবে না? কেউ যদি একে 'সাম্প্রদায়িকতা' বা 'বর্বরতা' দাবি করে আর যদি বলেঃ এই পৃথিবীতে একটা খরগোশের কিংবা একটা আমগাছেরও 'সমান' অধিকার আছে (বা বেশি অধিকার আছে), একটা খরগোশ বা একটা আমগাছকে বাঁচানোর জন্য একজন মানুষের জীবন নিয়ে নেয়া যেতে পারে - তাহলে তার এই মতবাদ কি 'সঠিক'? নাকি 'ভুল'? একজন স্রষ্টা না থাকলে কিভাবে এটা নির্ধারিত হবে? সবাই তা মানতে বাধ্যও বা হবে কেন? আর কেউ সেটা না মানলে তাকে 'বর্বর' তকমা লাগানো যাবে কি না?

তৃতীয়ত,

আর স্রষ্টা যদি থেকে না থাকে, তাহলে কেউ যদি 'ভুল' বা 'বর্বর' মতাদর্শও বেছে নেয়, এতে কি কিছু আসে যায়? দিনশেষে একজন 'সভ্য' মানুষ আর একজন 'অসভ্য' মানুষ সবাই তো বিবর্তনেরই ফল! আর একসময় এই সব মানুষ + সমগ্র মহাবিশ্বই ধ্বংস হয়ে যাবে। সবকিছুর ফলাফলই শুন্য। লিবারেল, কমিউনিস্ট, পুঁজিবাদী, সমাজবাদী, নারীবাদী, নাৎসিবাদী, গান্ধীবাদী, হিন্দুত্ববাদী - সবার শেষ পরিনতিই এক।

শুন্য। বিশাল এক শুন্য।

কেন একজন মানুষ 'ভালো' হয়ে চলবে? সবাই তাহলে 'নৈতিক' জীবন বেছে নেবে কেন? এসবের অর্থ কী?

মানুষ নিজেই নিজের জীবনের অর্থ তৈরি করে নেবে? কিসের ভিত্তিতে করবে? কেন করবে? কিভাবে করবে?

সুখীভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে? মুসলিমরা পূর্ণ ইসলামী জীবনব্যাবস্থার অধীনে যদি 'সুখী' হয়ে বাস করে, তাহলে তারা কিসের ভিত্তিতে ইসলামকে 'অনৈতিক' বা 'বর্বর' প্রমাণ করবে? একজন মুসলিমের জীবনের একটা অর্থ আছে উদ্দেশ্য আছে। নাস্তিক্যবাদীদের নিজেদের ব্যাপারে এমনটি দাবি করার মতো নৈতিক ভিত্তি নেই। তাদের নিজেদের মতাদর্শের ভিত্তিতেই তাদের এটা নেই। কোনো নাস্তিক্যবাদী এমন দাবি করে যেঃ আমরা একটা ক্ষুধার্থ প্রাণীকে খাদ্য দিয়ে বা অসহায় মানুষের সেবা করে জীবনকে 'অর্থপূর্ণ' করে তুলতে পারি। কিন্তু এটাও তো তাদের নিজদের বানানো অর্থ। এই অর্থের সাথে কেউ একমত না হলে কিভাবে তা ভুল প্রমাণিত হবে? কেউ যদি সিরিয়াল কিলিং করা কিংবা ধর্ষণ করাকে জীবনকে 'অর্থপূর্ণ' করার মাধ্যম হিসেবে নেয় তাহলে এই অর্থকে ভুল প্রমাণ করার উপায় কী যদি কোনো স্রষ্টা না থাকে, স্রষ্টার বিধান না থাকে আর পরকালের বিচার না থাকে? আর তাদের মতাদর্শ অনুসারে এই অর্থের এই অনুভূতিগুলোও তো মানবদেহের বিভিন্ন চিন্তাধারা তথা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই ফলাফল। আমরা দাবি করি না যে নাস্তিক হলেই কেউ খুনী, মাদকাসক্ত হয় বা চরিত্রহীন হয়। কোনো কোনো নাস্তিকও দানশীল হতে পারে, পরোপকারী হতে পারে। কিন্তু কোনো স্রষ্টা না থাকলে কেউ মাদকাসক্ত হলেও কিছু আসে যায় না, দানশীল হলেও আসে যায় না, খুনী হলেও কিছু আসে যায় না। দিনশেষে সব কিছুই ধ্বংসশীল, সবকিছুই শুন্যে বিলীন হবে। আর ফিরে আসবে না, কোনো বিচার হবে না।

স্রষ্টাবিহীন নাস্তিকদের মতাদর্শের আসলে কোনো অর্থ নেই। তারা সব সময় দাবি করে 'প্রমাণ' ছাড়া কিছু বিশ্বাস করে না। অথচ সেই তারাই প্রমাণবিহীন কিছু নৈতিকতার ধারণা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দিন-রাত ক্যাম্পেইন চালায়। তাদের এই সকল কর্মপ্রয়াস আসলে অর্থহীন, সময়ের অপব্যয়।

আমরা আল্লাহর নিকট সকলের হেদায়াতের জন্য দোয়া করি। আমরা সকলকে ইসলামের দিকে আহ্বান করি। অর্থহীন জীবন ও বানোয়াট মতাদর্শ ছেড়ে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসার আহ্বান করি, অর্থপূর্ণ জীবনের দিকে আহ্বান করি।

"আর আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

[আল কুরআন, দুখান ৪৪ : ৩৮]

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।"

[আল কুরআন, যারিয়াত ৫১ : ৫৬]

"আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

[আল কুরআন, মু'মিনুন ২৩ : ৭১]

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।"

[আল কুরআন, বুরুজ ৮৫ : ১১]

লিখেছেন : মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার
***© https://response-to-anti-islam.com

বাংলাদেশে সেক্যুলার নাস্তিকেদের মূল উদ্দেশ্য কি?

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে আমাদেরকে জানতে হবে নাস্তিকতা বিষয়টি কি?? এবং বাংলাদেশে যারা নাস্তিক বা যাদেরকে নাস্তিক ভাবা হয় তারা আদতে কি নাস্তিক??

নাস্তিকতা একটি দর্শন। প্রতিটি মানুষের একটি দর্শন রয়েছে। যেমন আমাদের মুসলিমদের একটি দর্শন রয়েছে, খ্রিস্টানদের দর্শন রয়েছে তেমনি হিন্দু ধর্মেরও দর্শন রয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিটি ধর্মেরই দর্শন রয়েছে। ঠিক তেমনভাবে নাস্তিকতাও একটি দর্শন। আমি জীবনে দুই একজন নাস্তিকের সাথে কথা বলেছি। বিশ্বাস করেন তাদের সাথে কথা বলার পর নাস্তিকতা সম্পর্কে আমার ধারনা পাল্টে গিয়েছে।

যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলেন তারা কখনও ধর্মবিদ্বেষী হয়না। আমরা যেমন মনে করি প্রতিটা ঘটনা ঘটে ঈশ্বরের আদেশে তেমনি তারা মনে করেন যে এই ঘটনাটার পেছনে ঈশ্বর বা স্রষ্টার কোন হাত নেই বরং এই ঘটনাটা ঘটেছে ভবিতব্যের কারণে। এ থেকে আমরা বলতে পারি তারা তাদের দর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীর ঘটনাগুলোকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। যেভাবে আমরা আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলোকে আমাদের দর্শনে বিচার করি।

এবার আসেন বাংলাদেশের সেকুলার এবং নাস্তিক কারা সেই প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের যে সমস্ত সেকুলার এবং নাস্তিকদের আমরা চিনি এরা আদতে সেকুলার বা নাস্তিক নন। এরা সকলে ইসলামবিদ্বেষী। এদের মূল লক্ষ্য ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো। ইসলামের বিষয়ে সমাজের মধ্যে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে দেওয়া। এরা চায় বাংলাদেশকে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে গড়ে তুলতে। সেই পশ্চিমা সংস্কৃতি বাংলাদেশ নিয়ে আসতে চায় যে সংস্কৃতি হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্যের পুরোপুরি বিপরীত। গত ১০০ বছরে পশ্চিমা বিশ্ব যে গতিতে নিজেদেরকে উন্নত দাবি করছে আসলে কি তারা ততটা উন্নত?? এতে কোন সন্দেহ নেই পশ্চিমা বিশ্ব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে আমাদের চেয়ে ঢের এগিয়ে। কিন্তু পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা আমাদের থেকে এখনও অনেক অনেক পিছিয়ে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একটি পরিবারের মধ্যে যেরকম বন্ধন দেখা যায় পশ্চিমা বিশ্বে এরকমটা নয়। আমাদের পরিবারে বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে ধরনের আন্তরিকতা, যে ধরনের সহমর্মিতা দেখা যায় পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে এর ছিটেফোটাও নেই। এ কারণে সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ বেশি। সেখানে বিবাহ বহির্ভূত গর্ভপাতের সংখ্যা বেশি। পশ্চিমা বিশ্বে বাবা-মাকে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে রাখা হয়। বাংলাদেশের হাজার বছরের সংস্কৃতিতে তো কখনো বৃদ্ধাশ্রম কথা ছিল না। বৃদ্ধাশ্রম এর কনসেপ্ট মূলত পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরই একটা অংশ। আমাদের

ইসলাম ধর্ম ও বৃদ্ধাশ্রমকে সমর্থন করে না বরং আমাদের ধর্মে বলা আছে বৃদ্ধ বাবা-মার সেবা করার কথা। যেই সংস্কৃতি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে বাধা সৃষ্টি করে সেই সংস্কৃতিকে এরা বাংলাদেশে আনতে চায়।

এরা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে কেনো লেখে জানেন?? কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে যখন লেখা হবে তখন নিরাপত্তার খাতিরে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদেরক সে দেশগুলোতে আশ্রয় দেবে। সেখানে তাদের বিনামূল্যে থাকা পড়ার সুযোগ করে দেবে। বাংলাদেশ কি তারা এই সুযোগটা পাবে?? তারা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধেই লেখবে। তারা অন্য কোন ধর্ম বিরুদ্ধে লিখবে না। (যদিও কোন ধর্মকে কটাক্ষ করে কোন ধরনের মত প্রকাশ করা ঠিক না)। কারণ তারা ভালমতই জানে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে উল্টো পাল্টা লেখলে ঐ সমস্ত দেশ থেকে তাদের কান ধরে বের করে দেবে। সেখানে একদিনও তারা টিকতে পারবে না।

শেষমেষ এটুকুই বলতে চাই বাংলাদেশে যাদেরকে সেকুলার বা নাস্তিক বলে আপনারা চেনেন বা জানেন এরা কেউই সেকুলার বা নাস্তিক নয়। এরা সবাই ইসলামবিদ্বেষী এবং ভন্ড।

© Quora ওয়েবসাইটে মোহাম্মদ আফিয়ানের মন্তব্য তুলে ধরা হইছে।

নাস্তিকদের ছোবলে দেশের যুবসমাজ

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের জীবনাচারকে বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদার প্রশ্নে কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলা না গেলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ধর্ম এখানকার জনজীবনে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ধর্মপালনে শিথিলতা থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মানুভূতি যথেষ্ট তীব্র। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুকৌশলে ধর্মহীনতা প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও প্রকাশ্যভাবে ধর্মদ্রোহিতা বা নাস্তিকতার কোনো স্থান কখনোই হয়নি। তাই যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, জনগণকে পক্ষে টানার জন্য অন্তত ভোটের সময় হলেও ধর্মের গুণগান করতে দেখা যায়। যে কারণে দাউদ হায়দার, আহমাদ শরীফ, তাসলিমা নাসরীন, হুমায়ুন আজাদের মতো গুটিকয় ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিক যারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, বাংলাদেশের গণমানুষের হৃদয়ের গভীরে তাদের তো কোনো আশ্রয় হয়ইনি; বরং তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছে প্রবল ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধ। এমনকি তাদের অনেককেই শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটায় জনসাধারণের নাগালের বাইরে বাংলা ব্লগস্ফিয়ার জুড়ে যে এক শ্রেণীর নাস্তিক চক্র গড়ে উঠেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সেখানে যে

উদ্বেগজনক ও কুৎসিত অপপ্রচার শুরু করেছে, তা পূর্ববর্তী নাস্তিকদের সকল অপতৎরতাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কোনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। এর কারণ হলো এদের অবস্থান সমাজে নয় বরং ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগতে। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটে বাংলা ব্লগস্ফিয়ার সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশে এত বিরাট সংখ্যক নাস্তিক ঘাপটি মেরে আছে। অনেককেই বলতে শুনেছি, ব্লগে না এলে বাংলাদেশে যে এত নাস্তিক আছে, তা হয়তো জানতেই পারতাম না। অবশেষে ব্লগার রাজীব নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এই নাস্তিক চক্রের ভয়াবহ অপতৎপরতা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ না পেলে, তারা হয়তো আরো অনেকদিন সাধারণ মানুষের অগোচরেই থেকে যেত। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি '১৩ রাজধানী ঢাকায় জনৈক নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দারের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নাস্তিকতার যে ভয়াল চিত্র উন্মোচিত হয়েছে, তা সমগ্র দেশবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। নাস্তিকতা যে কত নিকৃষ্ট হতে পারে, ধর্মহীনতা যে মানুষকে পশুত্বের ও নৈতিক অবক্ষয়ের কোন অতলে নিক্ষেপ করতে পারে, তথাকথিত 'মুক্তবুদ্ধি'র চর্চার আড়ালে ইসলামবিদ্বেষের যে কী জঘন্যতম কুৎসিত অবয়ব লুকিয়ে আছে, তার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে এই চিত্রে। লক্ষণীয় যে, ইন্টারনেটে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসার বেশ জোরালোভাবে শুরু হলেও কোন এক অজানা কারণে গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। ফলে এ দেশে নাস্তিকতার এই ভয়ঙ্কর রূপটি জনসমাজে এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক চক্রটি দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য সুদূরপ্রসারী মিশন গ্রহণ করে। এ মিশন যে বেশ সাফল্যের সাথেই এগিয়ে চলেছে রাজীব হায়দার গংদের এই ঘৃণ্যতম দুঃসাহসিক অপতৎপরতা তারই প্রমাণ বহন করে। এদের মরণ ছোবলের শিকার হয়ে শহুরে শিক্ষিত তরুণ সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বিপজ্জনকভাবে বীতশ্রদ্ধভাব ও সংশয় পোষণ করা শুরু করেছে । পাঠকদের অনেকেরই প্রশ্ন, ইন্টারনেটভিত্তিক ব্লগিং আসলে কী এবং ব্লগারদের মধ্যে নাস্তিকতার এত প্রসার কেন? মূলত ইংরেজি শব্দ 'ব্লগ' হলো ওয়েবলগ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এমন একটি ওয়েবসাইট যাকে তুলনা করা যায় ব্যক্তিগত ডায়েরির সাথে। অন্যভাবে এগুলোকে উন্মুক্ত অনলাইন ম্যাগাজিনও বলা যায়। ইন্টারনেটে নিজস্ব ব্লগসাইট বানিয়ে দৈনন্দিন ডায়েরি লেখার মতো অনেকেই লেখালেখি করে থাকেন। এরূপ ব্যক্তিগত লেখালেখিকে একক ওয়েবসাইটে সমন্বিত করে একটি ভার্চুয়াল কমিউনিটি সৃষ্টি করা এবং সেখানে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় কমিউনিটি ব্লগ। যিনি ব্লগে লেখালেখি করেন বা বিবিধ কন্টেন্ট পোস্ট করেন তাকে 'ব্লগার' বলে। এ সকল ব্লগে একাউন্ট খুলে লেখালেখির মাধ্যমে ব্লগের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মতের আদান-প্রদান করা যায় খুব নির্বিঘেœ। এ কারণে কমিউনিটি ব্লগগুলো খুব দ্রুতই তরুণ সমাজের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি ২০১০ সালে দেশে ইন্টারনেটে

সর্বাধিক ব্যবহৃত শীর্ষ ১০টি ওয়েবসাইটের তালিকায় ৭টিই ছিল এই সকল ব্লগসাইট। বাংলাভাষায় সামাজিক ব্লগ হিসেবে ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম 'সামহয়্যার ইন ব্লগ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইন্টারনেটের প্রসার লাভ করার সাথে সাথে ব্লগিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে একে একে সৃষ্টি হয় নাগরিক ব্লগ, আমার ব্লগ, প্রথম আলো ব্লগ, সোনারবাংলা ব্লগের মতো জনপ্রিয় ব্লগগুলো। কখনো লেখালেখির অভ্যাস ছিল না, এমন বহু তরুণের লেখার হাতেখড়ি হয়েছে ব্লগের মাধ্যমে। যদিও ইদানীং ফেসবুক-টুইটারের দাপটে ব্লগসাইটের জনপ্রিয়তা বেশ কমে এসেছে। ব্লগগুলোর জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল, ব্লগ মডারেটরদের বেঁধে দেয়া সাধারণ কিছু নীতি মেনে স্বাধীনভাবে যে কোনো বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করা এবং অন্যের কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পৌঁছে দেয়ার অনন্য সুযোগ পাওয়া। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্লগের এই অভূতপূর্ব স্বাধীনতার কোনো জুড়ি নেই। ফলে সরকারি বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে অবাধ ও স্বাধীন মতপ্রকাশের এই উন্মুক্ত অঙ্গনটি ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের জন্য মহা সুযোগ হয়ে ওঠে। যেহেতু এ দেশে সামাজিকভাবে ধর্মবিরোধী নাস্তিকদের কোনো ঠাঁই নেই, তাই এই নিরাপদ (!) স্থানে এসে তারা কখনও স্বনামে কিংবা বেশির ভাগই বেনামে মনের সুখে নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর মওকা পেয়ে যায়। অন্য দিকে 'উদারমনা' নাস্তিক্যবাদী বিভিন্ন ব্লগ মডারেটররাও 'মুক্তচিন্তা' প্রকাশের নামে এদেরকে সাদরে ঠাঁই দিতে থাকে। এভাবেই ব্লগ হয়ে ওঠে নাস্তিকদের জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ অভয়ারণ্য। স্বঘোষিত নাস্তিক ব্লগ 'মুক্তমনা'র মডারেটর তা স্বীকার করে বলেছে, 'গত কয়েক বছরে স্বচ্ছ চিন্তাচেতনা সম্পন্ন মুক্তমনা যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থান ঘটেছে বিভিন্ন ফোরামে এবং আলোচনাচক্রে, যা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমে সম্ভব ছিল না মোটেই।' উল্লেখ্য যে, ব্লগিং মানেই কিন্তু নাস্তিকতা নয়। কেননা ব্লগীয় পরিমণ্ডলে স্বল্পসংখ্যক নাস্তিক গোষ্ঠীর বিপরীতে সুস্থ ও মননশীল চিন্তাধারার প্রচুর সংখ্যক ধর্মপ্রাণ লেখকও রয়েছেন। বরং তাদের বিপরীতে নাস্তিকদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য বলা যায়। যারা নিজেদের মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যয় করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল লড়াইয়ে তথা তাদের যুক্তি-কুযুক্তির শিকড় উপড়ে ফেলার যুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ব্লগে বিচরণশীল নাস্তিকেরা মূলত ৩ ভাগে বিভক্ত। ১. যারা ঘটনাক্রমে কিংবা পরিবেশগত কারণে ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেছে এবং ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তবে সাধারণত কিছুটা সংযত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সুশীলতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর ভদ্রবেশী নাস্তিকের সংখ্যা অবশ্য ব্লগে খুব নগণ্যই। ২. যারা প্রবল ধর্মবিদ্বেষী। এরা এমনই উগ্র যে, যেকোনো সুযোগে অত্যন্ত অশ্লীল ও ক্লেদাক্ত ভাষায় ধর্মকে আক্রমণ করে। কুরআনের আয়াতসমূহ, রাসূল (সা)-এর ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ অপবাদ আরোপ করা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রƒপ করাই তাদের প্রধান কাজ। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জঘন্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা। তাদের চিন্তাধারা ও গালাগালির রূপ-প্রকৃতি এতটাই নিম্নরুচির যে তাদেরকে সাধারণভাবে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত

ভাবতেই কষ্ট হয়। ব্লগে এই প্রকার ইতর শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ৩. যারা সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে না, নিজেদের নাস্তিকও বলে না। তবে ধর্মবিরোধী আলোচনায় নাস্তিকদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। তারা সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, সুশীল, উদারমনা ইত্যাদির ছদ্মাবরণে প্রকারান্তরে নাস্তিক্যবাদের সেবাদাস হিসেবেই কাজ করে। ব্লগে এই শ্রেণীর নাস্তিকের সংখ্যাও প্রচুর। তবে মজার ব্যাপার এই যে, নীতিগতভাবে সর্বধর্মবিরোধী হলেও কার্যক্ষেত্রে এসব নাস্তিকদের একমাত্র টার্গেট হলো ইসলাম। ইসলামই তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু। শোনা যায়, নাস্তিক ব্লগারদের অনেকেই না কি মূলত হিন্দু। যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলিম নাম ব্যবহার করে এবং ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। মুক্ত সামাজিক ব্লগগুলোতে তাদের নীতি হলো, প্রথমে রাজাকার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাইনবোর্ড নিয়ে সাধারণ ব্লগারদের সহানুভূতি আদায় করা। অতঃপর সুযোগ মতো ধর্মবিদ্বেষের ছোবল মারা। এদের নিজস্ব কিছু ব্লগও রয়েছে। যেমন মুক্তমনা, আমার ব্লগ, ধর্মকারী, নবযুগ প্রভৃতি। যেখান থেকে তারা উগ্র ধর্মবিদ্বেষের এমনই বিষবাষ্প ছড়ায়, নোংরামি আর ঘৃণ্য মনোবৃত্তির এমন দুর্গন্ধময় প্রদর্শনী করে, যা কোন সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। বরং চাক্ষুষ না দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না। অথচ ‘সোনারবাংলা’, ‘সদালাপ’, ‘বিডিটুডে’র মতো কতিপয় ইসলামপন্থী ব্লগ ছাড়া বাকি সমস্ত ব্লগই নীতিমালায় ‘ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানো নিষিদ্ধ’ লিখে রাখার পরও কম-বেশি এই শ্রেণীর নাস্তিকদের প্রোমোট করে আসছে। নিম্নে নাস্তিক চক্রের পরিচালিত প্রসিদ্ধ ব্লগ ‘ধর্মকারী’ থেকে তাদের উগ্র ইসলামবিদ্বেষের দু-একটি নমুনা দেয়া হলোÑ ‘ধর্মকারী’র হোম পেইজের চলমান সেøাগানে দেখা যায়, “আল্লাহ সর্বব্যাপী তিনি বরাহেও আছেন, বিষ্ঠাতেও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি বোরখাতেও আছেন, বিকিনিতেও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি জলাশয়েও আছেন, মলাশয়েও আছেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, তিনি উটমূত্রেও আছেন, কামসূত্রেও আছেন।’ হোম পেজের ডানদিকে ব্লগের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে- “ধর্মকারী যুক্তিমনস্কদের নির্মল বিনোদনের ব্লগ। বিতর্ক বা বাগি¦তণ্ডার স্থান নেই এখানে। এই ব্লগে ধর্মের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, অপদস্থ করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে। যেমন করা হয়ে থাকে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে।” এই স্লোগান ঝুলিয়ে রেখে ব্লগটির সর্বত্র অবর্ণনীয় নোংরামি সহকারে যাচ্ছেতাই ভাবে ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে। যেমন সম্প্রতি পোস্ট করা হয়েছে এমন কয়েকটি লেখার শিরোনাম ছিল এমনÑ ‘ইসলামী ইতরামি’, ‘নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে’, ‘ধর্মাতুল কৌতুকিম’, ‘ইসলামে বর্বরতা’। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনের ভাষা অবিকল নকল করে ব্যঙ্গ প্যারোডি রচনা করা, হাদীসকে ‘হা-হা-হাদীছ’ বলে টিটকারীর মাধ্যমে যে জঘন্যতম বমন উদ্রেককারী বিকৃতরুচির লেখা তারা সেখানে স্থান দিয়েছে, তা জনস্বার্থে প্রকাশ করতে চাইলেও কোনো মতেই বিবেকে সায় দিচ্ছে না। সেখানে সাইডট্যাবে বিজ্ঞাপন আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে ৭টি সচিত্র কমিক ই-বুক। ব্যঙ্গ করে যেসব বইকে বলা হয়েছে ‘ধর্মকারী কিতাব’। এর মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস কমিক বইটি রচিত হয়েছে ‘হজরত মহাউন্মাদ

ও কোরান-হাদিস রঙ্গ' শিরোনাম দিয়ে। জনৈক আব্দুল্লাহ আজীজ রচিত ২৬ পৃষ্ঠার বইটিতে রাসূল (সা)-এর জীবনচরিত নিয়ে এত অশ্লীল কার্টুনচিত্র আর জঘন্য কোলাজ রচনা করা হয়েছে, যা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। নরকের কীট, সাক্ষাৎ শয়তান এই কুলাঙ্গার কিভাবে এ দেশের মাটিতে বসে এমন একটি বই রচনার দুঃসাহস পেল, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই ব্লগে নিহত ব্লগার রাজীবও 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে লিখত। 'নূরানী চাপা শরীফ' শিরোনামে সে এখানে হজরত মুহাম্মদ (সা:)-সহ মুসলমানদের ঈদ উৎসব নিয়ে জঘন্যতম কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ লেখা লিখেছে, যা ইতোমধ্যে দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারনেটে তথাকথিত প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী নাস্তিকদের এই নোংরা ও কদর্য অপপ্রচার যে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তারা চায় এ দেশকে পুরোপুরি ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আর এই ধর্মহীনতার মধ্যেই তারা খুঁজতে চায় বাঙালির নবজাগরণ (?)। বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখির সূতিকাগার খ্যাত 'মুক্তমনা'র পরিচিতিতে লেখা হয়েছে- "মুক্তমনা'র মাধ্যমে আমরা একদল উদ্যমী স্বাপ্নিক দীর্ঘদিনের একটি অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করছি, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠছে 'চেতনামুক্তির' লড়াই। যার মাধ্যমে জনচেতনাকে পার্থিব সমাজমুখী (অর্থাৎ ধর্মহীন) করে তোলা সম্ভব....আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস (ধর্ম) এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, মুক্তমনারা মনে করে তা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়ের মতো বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যেন বাঙালির এক নবজাগরণ।" এই ব্লগের প্রধান কর্ণধার স্বঘোষিত নাস্তিক অভিজিৎ রায় হলো আমেরিকা প্রবাসী পিএইচডি ডিগ্রিধারী বর্ণবাদী হিন্দু। এই উগ্র ইসলামবিদ্বেষী বর্তমানে বাংলাদেশের নাস্তিকদের আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে তার রচনায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'অবিশ্বাসের দর্শন', 'বিশ্বাস ও বিজ্ঞান', 'ধর্ম ও নিধর্ম সংশয়', 'স্বতন্ত্র রচনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি', 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ইত্যাদি উগ্র নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার বইসমূহ। এত গেল কেবল বাংলা ব্লগস্ফিয়ার। বর্তমানে ব্লগের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী, অবাধ ও স্বাধীন মুক্তমঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠেছে ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ। যেখানে প্রতিদিন বহু ইসলামীবিদ্বেষী বাংলা পেজ খোলা হচ্ছে। সেসব পেজে সমানে ছড়ানো হচ্ছে হিংসা ও ঘৃণার বিষাক্ত মন্ত্র। পবিত্র কুরআনের আয়াতের অনুকরণে ব্যঙ্গাত্মক প্যারোডি রচনা, রাসূল (সা)-কে গালিগালাজের সেসব দৃশ্য যাদের মধ্যে সামান্যতম ঈমানও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের হৃদয়েও রক্তক্ষরণ না ঘটিয়ে পারবে না। শাহবাগ আন্দোলনে এই নাস্তিক ব্লগার গোষ্ঠীই প্রথম রাস্তায় নেমেছিল। 'যুদ্ধাপরাধের বিচার' ছিল তাদের সাইনবোর্ড। কিন্তু অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল ব্লগের ক্ষুদ্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা এবং পরম কাঙ্ক্ষিত সেই নাস্তিক্যবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজ বপন করা। যার মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের

মন ও মনন থেকে ধর্ম নামক অনুষঙ্গটির শেষ শিকড়টিও তারা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ‘একাত্তরের চেতনা’র মুলো ঝুলিয়ে এবং ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তারা মীমাংসা করে ফেলতে চেয়েছিল এ দেশের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম নামক এই ‘আরবীয় ধর্মে’র (?) আর কোনো স্থান থাকবে কি না সেই প্রশ্নটিরও। এ কথা সত্য যে, এত কিছুর পরও বাংলাদেশে উঠতি নাস্তিকদের এই সীমাহীন দৌরাত্ম্য মূলত ইন্টারনেট অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে সমাজে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার চর্চা করার মতো মেরুদণ্ড যে এদের নেই, তা শাহবাগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় পরিষ্কার। কিন্তু তাতে কী? শিক্ষিত উঠতি তরুণ সমাজের হাতে ইন্টারনেট এখন অনেক সহজলভ্য। ফলে অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে তারাই সর্বপ্রথম এই নাস্তিকদের অপপ্রচার ও মগজধোলাইয়ের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে তরুণদের মস্তিষ্ক বিকৃত করার জন্য আরজ আলী মাতুববর, আহমাদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদদের অনুসারীদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্তই কম ছিল না। তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবতাবাদী কবি-সাহিত্যিকেরা এবং সেক্যুলার মিডিয়াগুলো এতদিন আড়ালে-আবডালে সংগোপনে সুকৌশলে নাস্তিকতা প্রচার করে আসছিল অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা ও মানবাধিকার প্রভৃতি সুরক্ষার জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু বর্তমানের এই জঙ্গি সাইবার নাস্তিকেরা তাদের চেয়ে বহু গুণে ভয়ঙ্কর। যে দেশে দাউদ হায়দার, তাসলিমা নাসরীনদের ঠাঁই হয় না, সেই দেশে তাদের চেয়ে হাজার গুণ বর্বর এই উগ্র নাস্তিক গোষ্ঠী কিভাবে বহাল তবিয়তে টিকে থাকে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে কি এর পেছনে কোনো মহলের বিশেষ মিশন কাজ করছে? ২০১১ সালে আমেরিকার ‘সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস’ আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া কিভাবে ছড়ানো হচ্ছে তার ওপর ৬ মাসব্যাপী তদন্ত চালায়। অতঃপর Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America শিরোনামে ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গবেষণা রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট মতে, আমেরিকার ৭টি সংস্থা গত ১০ বছরে ৪২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। যার একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয় ইন্টারনেটে ইসলামবিদ্বেষী ম্যাটেরিয়াল সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ফোরাম ও ব্লগের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর কাজে। সুতরাং এ দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য এই নাস্তিক চক্রকে বিশেষ কোনো মহল পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে কি না, তা অবিলম্বে খতিয়ে দেখা জরুরি। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ সরকার ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়ক আইন করলেও সেখানে ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন আছে কি না, বা থাকলেও তা কতটুকু কার্যকর, তা বোঝার উপায় নেই। গত বছরের ২৫ জানুয়ারি সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে একটি বিশেষ টিম গঠন করে বিটিআরসি। একই বছরের ২২ এপ্রিল থেকে contact@csirt.gov.bd ঠিকানায় সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে পরামর্শ ও অভিযোগ গ্রহণ করা শুরু হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারও কোনো কার্যকারিতা নেই। বর্তমানে রাজীব হত্যার পর বিটিআরসির আবারও কিছু তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। দেশ ও জাতির সুরক্ষায় সরকার যদি এই চিহ্নিত নাস্তিক গোষ্ঠীর অপপ্রচার দমনে আন্তরিকভাবেই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে, তবে তা হবে খুবই আশাব্যঞ্জক।

একই সাথে ইন্টারনেট থেকে যুবসমাজের চরিত্রবিধ্বংসী যাবতীয় কন্টেন্ট ব্লক করে দেয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি। পরিশেষে তরুণসমাজকে বলব, ইসলামবিদ্বেষী মহল দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মহীন করার জন্য সুকৌশলে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এতদিন তারা আমাদেরকে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। আজ তারা আর রাখ-ঢাক না করে সরাসরি মুসলিম জাতির মূল চেতনাকেন্দ্র পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা)-কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। সুতরাং আর অপেক্ষার সময় নেই। এদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ঠিক তেমনি এদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য এবং নিজেদের আমল-আকিদা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। ব্লগ ও ফেসবুকে অপপ্রচারের খপ্পরে পড়ে অথবা কৌতূহলবশত আরজ আলী মাতুব্বর কিংবা হাল আমলের নাস্তিককুল শিরোমণি ক্রিস্টোফার হিচেন্স, রিচার্ড ডকিন্সদের বইপত্র নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে শিক্ষার্থী তরুণরা যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সাথে নাস্তিক্যবাদী ও মুখোশধারী কবি-সাহিত্যিকদের নষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতে হবে। আর অভিভাবকদেরও দায়িত্ব হবে কোনোরূপ শিথিলতা না দেখিয়ে তাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই ইসলামী চেতনায় সমুন্নত করা। যেন জীবনের উষালগ্নে তারা কোনরূপ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত না হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই নাস্তিকদের ষড়যন্ত্রকে রুখে দেয়ার তাওফিক দান করুন এবং এদের কূটচাল থেকে এ দেশের মুসলিম সমাজকে হেফাজত করুন। আমিন!

লেখক : শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও কলামিস্ট মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান।

©https://www.chhatrasangbadbd.com

ওরা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না

আমাদের সাহস হারাবার কিছু নেই। ইসলামের শত্রুরা যতই আদাপানি খেয়ে চেষ্টা করুক আমরা ঠিক থাকলে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের সব কৌশল বিফলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٥٤ ﴾ [ال عمران: ٥٤]

'আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪)

ওদেরর ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣ ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣]

‘তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩)
আরেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ ﴾ [الصف: ٨]

‘তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।’ (সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮)

আমাদের কাজ হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করা। নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী থেকেই আমরা নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ ﴾ [النحل: ١٢٥]

‘তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।’ (সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫)

ইসলামের শত্রুদের নির্মূলে চেষ্টা যদি সর্বোচ্চ হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেনই। প্রয়োজনে তিনি ফেরেশতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। নিচের আয়াতগুলোয় লক্ষ্য করুন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن
دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠
وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ۞
فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٢ ﴾ [الانفال: ٦٠، ٦٢]

‘আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না। আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। (সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৬০-৬২)

আমাদের কাজ নাস্তিকদের সাধ্যমত সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা। আমরা সুপথ দেখানোর পরও যদি ফিরে না আসে তবে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তো বলেই দিয়েছেন। তিনিই তাদের বিচারের ভার নিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُوَ يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٧ ﴾
[الصف: ٧]

‘সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ (সূরা আস-সফ, আয়াত : ৭)
আরেক আয়াতে অবাধ্যাচারীদের সতর্ক করে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ ٥٩ ﴾ [الانفال: ٥٩]

‘আর কাফিররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা (আযাবের) নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, নিশ্চয় তারা (আল্লাহকে আযাব প্রদানে) অক্ষম করতে পারে না।’ (সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৫৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿ وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِيرٗا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ ١٢٦
وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَنۡ أَسۡرَفَ وَلَمۡ يُؤۡمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦۚ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبۡقَىٰٓ ١٢٧ أَفَلَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ
أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١٢٨ وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ
سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامٗا وَأَجَلٞ مُّسَمّٗى ١٢٩ ﴾ [طه :١٢٤، ١٢٩]

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন?

তিনি বলবেন, 'এমনিভাবেই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল'। আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী। এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত।' (সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২৪-১২৯)

©https://www.hadithbd.com

নাস্তিকদের অসততা- একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : পর্ব-১

জাকির নায়েক আর কিছু করতে পারুক বা না পারুক, ওয়ার্ল্ডওয়াইড নাস্তিকদের 'মাথাব্যথা'র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিশ্চিত।

বাংলা নাস্তিকরা কোন মুসলিমকে কটাক্ষ করার আগে তাকে সরাসরি 'জাকির নায়েকের চ্যালা' 'জাকির নায়েকের মুরিদ' বলে থাকে।
জাকির নায়েকের নামকে বিকৃত করে তাকে 'জোকার নায়েক', এবং তার ছবিকে বিকৃত করে অসংখ্য কার্টুনও তারা বানিয়েছে এবং বানাচ্ছেও।

সে যাই হোক, জাকির নায়েক এবং উনার প্রতিষ্ঠিত 'পিস টিভি' কে গতবছর ভারত এবং বাংলাদেশে ব্যান করা হয় খুব সিলি একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে।
ইস্যুটা ছিলো- ঢাকার গুলশানের জঙ্গী হামলার সাথে জড়িতদের কোন একজন টুইটার বা ফেইসবুকে জাকির নায়েকের ফলোয়ার ছিলো এবং কোন একসময়, জাকির নায়েকের কোন একটি লেকচার সে শেয়ার করেছিলো।
এ থেকে ধারণা করা হয় যে, সেই জঙ্গীটা ডক্টর জাকির নায়েক দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে জঙ্গী কর্মকান্ডে জড়িয়েছে। মোদ্দাকথা, সেই জঙ্গীর সূত্র ধরে, জাকির নায়েক এবং উনার 'পিস টিভি' কে জঙ্গী কর্মকান্ডে উস্কানিদাতা হিসেবে দেখিয়ে ব্যান করে দেওয়া হয়।

জাকির নায়েক এবং উনার পিস টিভি ব্যান হওয়ার পর এদেশের মুক্তমনাদের মনে খুশির বন্যা বয়ে গেলো। সবাই খুশিতে বাক বাকুম বাক বাকুম করতে লাগলো। আহা! এতোদিনে সরকার একটা কাজের কাজ করেছে। এদেশের একজন নামকরা প্রফেসর, যিনি আবার নিজেকে বাক স্বাধীনতার পক্ষের লোক, অবাধ মত প্রকাশের (সে যার মত-ই হোক) পক্ষের লোক বলে জাহির করেন, যিনি নাস্তিক ব্লগারদের জন্য সবসময় মায়াকান্নায় ভেঙে পড়েন, তিনিও জাকির নায়েক এবং উনার টিভি ব্যান হওয়ার পর খুশিতে একখানা আর্টিকেল প্রসব করেছিলেন।

যা হোক, পয়েন্ট হলো- জাকির নায়েকের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই ছেলেটা জঙ্গী হয় এবং গুলশানে জঙ্গী কর্মকান্ডে জড়িয়ে এতোগুলো মানুষ খুন করে।
পয়েন্ট টু বি নোটেড- ছেলেটা জাকির নায়েককে ফলো করতো, এবং কোন এককালে জাকির নায়েকের একটা লেকচারের ভিডিও লিঙ্ক শেয়ার করেছিলো সোশ্যাল মিডিয়ায়।ছেলেটা যেহেতু জাকির নায়েককে ফলো করতো, সুতরাং, এখানে জাকির নায়েকও সমানভাবে দোষী। সুতরাং নাস্তিকদের অভিমত- জাকির নায়েক এবং তার টিভি চ্যানেল ব্যান হওয়াটা যৌক্তিক, ঠিক কাজ।
কারণ, জাকির নায়েক জঙ্গী কর্মকান্ডে উস্কানি দেয়।

এবার আরেকটা পয়েন্টে আসুন। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনকে তো চিনেন, তাই না?
হ্যাঁ, সেই চার্লস ডারউইন তার বিখ্যাত (যেটাকে বিবর্তনবাদের 'বাইবেল' গন্য করা হয়) বই 'The Origin Of Species: By means Of Natural Selection' এ পৃথিবীতে কীভাবে একটি এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিবর্তন ঘটেছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

যাহোক, সেই বইতে কোন কোন প্রাণীরা পরিবেশে টিকে থাকবে, সেটাও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এটার নাম দিয়েছিলেন- 'Natural Selection'। বলা চলে, এই ন্যাচারাল সিলেকশানই তার পুরো থিওরির মূলমন্ত্র। এজন্যই, বইয়ের নামের সাথেই উনি এই নামটাও জড়িয়ে দিয়েছিলেন (By means Of Natural Selection)Natural Selection এর মূল বক্তব্য হচ্ছে- 'প্রকৃতিতে একটি অবিরাম সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রাম হলো টিকে থাকার সংগ্রাম। দিনশেষে, প্রকৃতিতে তারাই টিকবে, যারা যোগ্য। অযোগ্য, দূর্বলরা বিলুপ্ত হবে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যারা দূর্বল, যারা সংগ্রামে টিকে থাকার অযোগ্য, তারা প্রকৃতিতে টিকে থাকবে না।

এটাকে Survival Of the Fittest বলা হয়।

আমি যখন একদিন এডলফ হিটলারের Mein Kampf (My Struggle) বইটা পড়ছি, তখন ঠিক একদম এরকম, হুবহু ডারউইনের কথার মতোই কিছু বক্তব্য খুঁজে পেলাম।

তিনি তার বই Mein Kampf এর ২৩৯-২৪০ পৃষ্টায় লিখেছেন- ' If nature doesn't wish that weaker individuals should mate with the stronger, she wishes even less that a superior race should intermingle with an inferior one; because in such cases all her efforts, throughout hundreds of thousands of years, to establish an evolutionary higher stage of being, may thus be rendered futile.

But, such a preservation goes hand-in-hand with the inexorable law that it is the strongest and the best who must triumph and that they have right to endure. he who would live, must fight. he who doesn't wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, hasn't the right to exist'

খেয়াল করুন, Hitler লিখেছে 'If Nature doesn't wish'

Nature বলতে তিনি ঠিক কী বুঝালেন? ডারউইন যে Natural Selection এর কথা বলে গেছেন, সেটা নয়তো? Hitler এখানে স্পষ্টতই একটি Superior Race এবং Inferior Race এর কথা উল্লেখ করেছে এবং বলেছে, প্রকৃতিতে এটি বলবৎ আছে। দূর্বল আর সবলের মধ্যে সংঘাত।

ঠিক যে কথাগুলো ডারউইন তার 'Origin Of Species' এ বলেছে।

Hitler এরপরে বলেছে, – ' it is the strongest and the best who must triumph and that they have right to endure.'

অর্থাৎ, যারা সবল এবং সর্বোৎকৃষ্ট, তারাই টিকে থাকবে এবং থাকা উচিত।

(যে কথাগুলো একইভাবে ডারউইনেরও)

Hitler আরো লিখেছে- ‘he who doesn’t wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, hasn’t the right to exist’অর্থাৎ, সংগ্রামই যেখানে Law Of Life (Naturally) , সেখানে যারা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবেনা, তাদের বেঁচে থাকার আদতে কোন অধিকার নেই।

Hitler ভাবতো, ইহুদীরা যেহেতু ম্লেচ্ছ, Inferior (তার দৃষ্টিতে), তাই প্রকৃতিতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই। তাই সে সমানভাবে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গনহত্যার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত করে দেয়।

তাহলে, আমরা যদি দাবি করি, ডারউইনের The Origin Of Species: By means Of Natural Selection’ বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে Hitler এরকম গনহত্যা করেছে, তাহলে কি তা খুব যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে যাবে? যেখানে সে নিজেই Evolutionary higher Stage এর কথা উল্লেখ করেছে।

এরকম আমরা যদি Hitler এর এই অপরাধের জন্য ডারউইনকে দোষী সাব্যস্ত করি, তার মরণোত্তর (যদিও ইম্পসিবল) মৃত্যুদন্ড দাবি করি, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে Theory Of Evolution পড়ানো বন্ধের দাবি তুলি, আমাদের নাস্তিক বন্ধুরা কি আমাদের সাথে একমত হবেন যেভাবে জঙ্গী কর্মকান্ডের সাথে জাকির নায়েকের Link করেছিলেন আপনারা? উত্তরের আশায় রইলাম।

(আমি বলছি না যে, হিটলারের কাজের জন্য ডারউইন দোষী। কিন্তু, একজন জঙ্গীর একটি সিলি ম্যাটার যদি জাকির নায়েককে বিচারের আওতায় আনে, হিটলারের ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য ডারউইনকেও বিচারের আদালতে তোলা যায়)

নাস্তিকদের অসততা- আরো একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : পর্ব-২

মার্ক্সিজমের সাথে ডারউইনিজমের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক হচ্ছে- দুইটাই একটা অন্যটার মাসতুতো ভাই। মুদ্রার এপিট-ওপিট।

মার্ক্সিজমকে আমরা মোটাদাগে Materialism তথা বস্তুবাদ বলতে পারি। যদিও মার্ক্সিজমের দাবি- মার্ক্সবাদ সমাজের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কাজ করে, তথাপি, এটার রূট (Root) লেভেলে যা আছে, তা হচ্ছে একটা Godless পৃথিবীর ধারণা।
যে পৃথিবীতে মানুষই সবকিছু। যেখানে কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের হাত নেই, অস্তিত্ব নেই। মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, কার্ল মার্ক্সের ধর্ম নিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। সেটি হচ্ছে- "religion is an opium for the people"
অর্থাৎ,- " ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য আফিমের মতোন।"
অনেকেই এই উক্তির ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা এটা দিয়ে বুঝাতে চায় যে, মার্ক্স নাকি ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করে ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়েছে। এটা পুরোদাগেই একটা ভুল ধারণা। মার্ক্স যা বুঝিয়েছে তা হলো, - আফিম খেলে মানুষ যেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে, ধর্ম মানলেও মানুষ ঠিক সেরকম অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে।

মার্ক্সিজমের একেবারে রূট লেভেলে যা আছে, সেটাই হচ্ছে ডারউইনিজম তথা নাস্তিকতার মূল বিষয়বস্তু। নাস্তিকতার মূল বেইসিসটাই হচ্ছে- A Godless world... যেখানে কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার নেই, কোন স্রষ্টা নেই, কোন ইশ্বর, আল্লাহ কিচ্ছু নেই।
এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজম বলতে যা বুঝায়, ডারউইনিজম তথা এথেইজম বলতেও ঠিক তা-ই বুঝায়। এখানে কেবল কিছু শব্দের রকমফের।

কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দু'জন। Karl Marx এবং Friedrich Engels। দুজনই ছিলেন জার্মান ফিলোসপার।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, Karl Marx এবং Friedrich Engels দুজনের সাথেই বিবর্তনবাদের জনক Charles Darwin এর ছিলো খুব ভালো সমঝোতা। Karl Marx উনার বিখ্যাত বই Das Kapital বিবর্তনবাদের জনক ডারউইনকে উৎসর্গ করেছিলেন।
যখন ডারউইনের প্রথম বই, The Origin Of Species প্রকাশিত হয়, Freiedrich Engels একটি চিঠিতে Karl Marx কে লিখেছিলো, - "Darwin , whom I am just now reading , is splendid" [1] এর প্রতিউত্তরে Marx লিখেছিলেন, - " This is the book which contains the basis in natural history for our view" [2] খেয়াল করুন, ডারউইনের The Origin Of Species এর জন্য Marx বললেন, - " এটাই সেই বই, যা আমাদের চিন্তাভাবনার বেসিস ধারণ করে।"

সুতরাং, মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজমের বেসিস থেকে আমরা কোনভাবেই চাইলে বিবর্তনবাদকে আলাদা করতে পারিনা। মার্ক্স তার ফিলোসপি হিসেবে যা করেছেন বা করতে চেয়েছেন, তার সেই ফিলোসফি এবং ডারউইনের ফিলোসফি যে একই,সেটা মার্ক্স নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, মার্ক্স Lessable নামে তাঁর এক বন্ধুকে আরেকটি চিঠিতে লিখেছেন, - " Darwin 's book is very important and serves me as a basis in natural science for the class truggle in history " [3] ডারউইন তাঁর বই The Origin Of Species এ তাঁর ফিলোসফি হিসেবে যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছিলেন, মার্ক্সের ফিলোসফিও তাঁর সাথে মিলে যায়।

Frederich Engels ডারউইন এবং মার্ক্সকে একই সমান্তরালে এনে লিখেছেন,- " Just as Darwin discovered the law of evolution in organic nature , so Marx discovered he law of evolution in human history" [4] কমিউনিজম এবং ডারউইনজমের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা বুঝাতে গিয়ে কার্ল মার্ক্সের একটি বায়োগ্রাফিতে লেখা হয়েছে এরকম, - "Darwinism presented a whole string of truth supporting Marxism and proving and developing the truth of it . The spread of Darwinist evolutionary ideas created a fertile ground for Marxist ideas as a whole to be taken on board by the working class ... Marx , Engels , and Lenin attached great value to the ideas of Darwin and pointed to their scientific importance , and in this way the spread of these ideas was accelerated" [5] মার্ক্সের যে ফিলোসফি, সেই ফিলোসফিকে যিনি বাস্তবরূপ দান করেছিলেন, তাঁর নাম Lenin. Lenin যে আন্দোলনের মাধ্যমে রাশিয়ার ক্ষমতায় বসে তাঁর নাম Communist Bolsheviks Movement। এই Bolsheviks আন্দোলন ছিলো রাশিয়ার ইতিহাসের একটি রক্তক্ষয়ী আন্দোলন।নিহত হয়েছিলো হাজার হাজার মানুষ। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো প্রচুর। এই Lenin ও ছিলো একজন নাস্তিক। তিনি বিবর্তববাদের জনক চার্লস ডারউইনকে নিয়ে বলেন, - " Darwin put an end to the belief that the animal and vegetable species bear no relation to one another , except by chance , and that they were created by God , and hence immutable" [6]

লেনিনের পরে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজমের শক্তপোক্ত হয়ে যে ক্ষমতায় আসে,তাঁর নাম হলো Stalin. স্ট্যালিন সম্পর্কে খুব বেশি মনে হয় বলার দরকার নেই। স্ট্যালিন তাঁর অগ্রগামী অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের মতোই একজন নাস্তিক ছিলেন। ইশ্বরে বিশ্বাস করতেন

না। পুরোদস্তর একজন বস্তুবাদী। ডারউইন সম্পর্কে স্ট্যালিন লিখেছে, - "There are three things that we do to disabuse the minds of our seminary students . We had to teach them the age of the earth , the geologic origin , and Darwin 's teachings" [7]

স্ট্যালিনের এক বাল্যবন্ধু স্ট্যালিনের জীবনী লিখেছিলেন। তিনি সেই বইতে লিখেছেন, - "At a very early age, while still a pupil in the ecclesiastical school , Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary sentiments. He began to read Darwin and became an atheist" [8] স্ট্যালিনের সেই বাল্যবন্ধু আরো লিখেছেন যে, স্ট্যালিন তাঁকে বলেছে ডারউইনের বই পড়েই সে (স্ট্যালিন) নাস্তিক হয়ে পড়ে এবং তাঁকেও (তাঁর বন্ধুকে) ডারউইনের বই পড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলো। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, কমিউনিজম = এথেইজম। এখন, পৃথিবীতে কমিউনিজম তথা এথেইজমের নামে যতো গণহত্যা হয়েছে , যতো মানুষ খুন হয়েছে, যতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চারভাগের একভাগের সিকিভাগও একত্রে পৃথিবীর সব ধর্মগুলোর ধর্মযুদ্ধেও তা হয়নি। একা হিটলারই গণহত্যা করে খুন করেছে ৬০ লক্ষ ইহুদি। লেনিন তো ভ্ললশেভিক আন্দোলনে গনহত্যা চালিয়েছেই, বিভিন্ন রেকর্ডমতে, স্ট্যালিন খুন করেছে প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ, এবং ঘরবাড়ি ছাড়া করেছিলো আরো ২০ মিলিয়ন মানুষকে।

[হিটলারের সাথে ডারউইনিজমের কী সম্পর্ক, তা এই লেখায় দেখিয়েছি]

এই কমিউনিজম তথা নাস্তিকতার নামে রাশিয়াতে খুন করা হয়েছে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ।চীনে (মাও সে তুং এবং অন্যান্যদের হাতে) খুন হয়েছে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন মানুষ, ভিয়েতনামে ১ মিলিয়ন মানুষ।উত্তর কোরিয়াতে ২ মিলিয়ন, কম্বোডিয়ায় ২ মিলিয়ন, পূর্ব ইউরোপে ১,৫০,০০০ , আফ্রিকাতে ১.৭ মিলিয়ন, আফগানিস্থানে ১.৫ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করা হয়। [9] আমাদের নাস্তিক বন্ধুরা, যারা আবার প্রোফাইলে ধর্মের জায়গায় 'মানবতাবাদী' সেট করে রাখে, তারা কী আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে যে তাদের স্প্রিচুয়াল এই সমস্ত 'গুরু'গণ 'মানবতার' নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, শান্তির নামে, ধর্মহীনতার নামে যে সকল গনহত্যা চালিয়েছে, যে সকল ইতিহাস বিখ্যাত ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য পৃথিবীতে ঘটিয়েছে, তা ঠিক কী বলে বিবেচিত হবে?কথায় কথায় ধর্মবাদীদের মৌলবাদী ট্যাগ দেওয়া, ধর্মকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের আঁতুড়ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা, ধর্ম মানেই সন্ত্রাস, ধর্ম মানেই খুন, হত্যা বলে বুলি আওড়ানো সেই সমস্ত মানবতাবাদী ভাই ব্রাদারগণ, যারা নিজেদের একইসাথে মানবতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতে পুলক অনুভব করেন, তারা কী আমাদের জানাবেন যে- পল পট, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, লেনিন সাহেবদের এহেন মহৎকর্মের কী

নাস্তিকীয় ব্যাখ্যা থাকতে পারে? কথায় কথায় মুসলিমদের জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলে চালানো নাস্তিক ভাইদের কাছ থেকে একটি সদুত্তর আশা করছি। আমি আশা করি, তারা খিস্তি খেঁউড় না করে, আমাকে প্রমাণ করে দেখাবেন যে- উপরে উল্লিখিত মহান নেতাগণ (!) আদতে নাস্তিক ছিলেন কী না। যদি নাস্তিক হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কর্তৃক সংঘটিত গনহত্যাগুলোর ব্যাখ্য কী? যদি তারা নাস্তিক না হয়, তাহলে তারা আদতে কী ছিলো? বা, নাস্তিক হয়ে থাকলে তাদের কাজকে আপনারা কীভাবে ডিফেন্ড করবেন?

লিখেছেন : আরিফ আজাদ

তথ্যসূত্রঃ

[1]. Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87

[2]. Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87

[3]. Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87

[4]. Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87

[5]. The Biography Of Karl Marx, Oncu Yayinevi, 368

[6]. False Religion Of Evolution, Kent Hovind

[7]. Landmarks in the life Of Stalin, E. Yaroslavsky

[8]. Landmarks in the life Of Stalin, E. Yaroslavsky

[9]. 'The black book of Communism', Stephene Courtois, Nivolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean- Louis Margoli, (Harvard University Press, 04)

© https://www.response-to-anti-islam.com

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাস্তিকতা এবং প্রতিকার

১. আগে জানতে হবে বাংলাদেশ কি কোন নাস্তিক আছে ?

...একদম চোখ বন্ধ করে এর উত্তর দেওয়া যায় "না, এই দেশে কোন নাস্তিক নেই"। আমি জানি আপনাদের অনেকেই এখন আমাকে নাস্তিক ট্যাগ দিতে উদগ্রীব হয়ে হয়ে পড়েছেন। আমাকে নাস্তিক ট্যাগ দেওয়ার পূর্বে পরবর্তী প্রশ্ন ও তার উত্তর দয়াকরে পড়ুন ।

২. যদি বাংলাদেশ কোন নাস্তিক না থাকে তবে ওরা কারা, যারা ফেইসবুক বা বিভিন্ন ব্লগে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে? ওরা কি নাস্তিক নয় ?

-----না, ওরা নাস্তিক নয় । নাস্তিক হওয়ার যোগ্যতা ও জ্ঞান তাদের নেই । তারা শুধু কিছু কুশিক্ষিত বেহায়া ও চরিত্রহীন লোক । যারা ধর্মের বাঁধার জন্য লম্পট, দুশ্চরিত্র কুৎসিত মনোভাষনা সরাসরি পূর্ন করতে পারে না । এরা সমাজের কিট । এদের মাঝে যেমন কিছু পুরূষ আছে তেমনি কিছু নারীও আছে । এরা ধর্ম বিদ্বেসী কিনতু নাস্তিক নয় । এরা কেউ ধর্ম বিদ্বেসী হয় বহু নারী-পুরূষের সাথে মিলনর জন্য । কেউ বা ধর্ম বিদ্বেসী হয় বিনা খরচে জার্মান যাওয়ার জন্য । তার জলন্ত প্রমান তসলিমা নাসরিন এবং আসিফ মহিউদ্দীন ।

এই সমস্ত ইসলাম বিদ্বেসীদের একটা ব্যাপার আমার চরম হাসির উদ্রেগ করে । তারা তাদের নিজ ভাষা বাংলাই সঠিকভাবে জানে না অথচ তারা আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ে তার ব্যাখা করতে যায় । এদের মত মূর্খ মানব আর হয়না । আল-কুরআন সম্পূর্ন আরবী ভাষায় লিখিত । একে সঠিক বা ভূল প্রমান করার জন্য আগে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণজানা আবশ্যক ।

মূলকথাঃ বাংলাদেশের লম্পট দুশ্চরিত্রের ইসলাম বিদ্বেসীদের টার্গেট থাকে ইমলামের বিরূদ্ধে লিখে জার্মানীর নজরে আসা । এবং বিনা খরচে জার্মান পাড়ী দেওয়া । জার্মান একটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাষ্ট । ইসলামের বিরূদ্ধে লিখার জন্য খ্রীষ্টানরা তাদের অর্থ দেয় এবং এক সময়ে জার্মান নিয়ে যায় । তারা যদি নাস্তিক হত তবে খ্রীষ্টানরা কখনও তাদের টাকা দিত না । কারন নাস্তিক হওয়া মানে সব ধর্মকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানকে ধর্ম হিসেবে মেনে নেওয়া ।

প্রতিকারঃ প্রকৃত এবং খাঁটি নাস্তিকদের জন্য কোন প্রতিকারের প্রয়োজন নেই । আপনার যদি নিজ ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে তবে তাদেরকে বুঝানোর দায়িত্ব আপনার । নাহয় আপনার ধর্ম আপনি পালন করুন আর তাদের ধর্ম তাদরকে পালন করতে দিন । কিন্তু যারা নাস্তিকের মুখোশ পড়ে শুধূ মাত্র বহু নারী এবং টাকার জন্য খ্রীস্টানদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে

তাদেরকে অঙ্কুরেই মেরে ফেলতে হবে । তাদের জন্য একটাই শাস্তি প্রযোজ্য "স্যুট এট সাইট" ।

© https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/blueprint/29948505

নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়

উদ্বেগের বিষয় হলো এমন ধর্মহীনের সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে। এক রাজিব লোকান্তরে কিন্তু বহু রাজিব অনলাইনে। নাস্তিকদের ওপর হামলা এর কোনো সুষ্ঠু সমাধান নয়। প্রয়োজন তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করা। মিডিয়াযুদ্ধে নেমে তাদের পরাস্ত করা। এত দিন যারা ফেসবুক ব্লগকে অবহেলা করেছেন, সময় হয়েছে তাঁদের নড়েচড়ে বসার। সময় হয়েছে জাতির কাণ্ডারিদের মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে মিডিয়া প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার।

অবশ্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে হবে না। এদের ভাষা ও বক্তব্য এতটাই নোংরা যে এসবের জবাব দেয়াটাও কোন ভদ্র মানুষের রুচিতে আসে না। সুতরাং রাজনৈতিকভাবেও এদের মোকাবেলা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে এদের আইনের আওতায় আনতে। ব্লগগুলোয় আমি কিছুদিন এদের সঙ্গে কথা বলেছি। এদের নোংরামি এতটাই জঘন্য যে আপনি এদের সঙ্গে কথা বলার রুচি হারিয়ে ফেলবেন। আমাদের জোটবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এদের মোকাবেলা করতে হবে। আর এদের অনলাইনের কুকীর্তি অফলাইনে জনসাধারণের সামনে আনতে হবে। তখনই এদেরকে যথাযথভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। মোদ্দাকথা কুকুরের মাথায় হাত বুলালে কোনোই লাভ হবে না। কখনো ‘যেমন কুকুর তেমন মুগুরে’র ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমার ফেসবুক বন্ধু মাওলানা আবদুল হক ঠিকই বলেছেন, আবহমান বাংলা আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। ৯০ শতাংশ মুসলিম-অধ্যুষিত হলেও এ দেশে অন্য সব সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠী সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করে। ধর্মের দিক থেকে এখানে কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়। সকল ধর্মেরই দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে, কমবেশি নিজস্ব সংস্কৃতিও আছে। কেবল একটি ধর্ম- হ্যাঁ, ধর্মই -এর বাইরে। এ ধর্মের নাম নাস্তিক্য। বাংলাদেশে নাস্তিক্যের কোনো ভিত্তি নেই, ঐতিহ্য নেই, সংস্কৃতি নেই। ভুঁইফোঁড়ও নয়, বরং এটা একটা আমদানিকৃত উপদ্রব।

নাস্তিকতা সেই একমাত্র অধর্মের ধর্ম, যা কোনো নীতিবোধে বিশ্বাস করে না। ফলে, আইনের চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলে একজন নাস্তিকের খুন বা ধর্ষণ না-করবার কোনো কারণ নেই।

অতএব নাস্তিক আর অমানুষ সমার্থক শব্দ। কিন্তু মানুষের মুখোশ পরে থাকে বলে এ অমানুষদের আমরা প্রায়ই চিনতে ভুল করি। মানুষের সমাজে মানুষের সঙ্গে মিশে থাকার প্রয়োজনেই অমানুষ নাস্তিকদেরকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। ছদ্মবেশ অপরিহার্য। এরা বাস করে গা ঢেকে, আত্মপরিচয় লুকিয়ে। কাপুরুষের মতো মাঝেমধ্যে লোকদেখানো সালাত আদায় করে। মরলে জানাযায়ও অংশ নেয়। তাই নাস্তিক মানেই ভণ্ড। কারণ সে খোলাখুলি কখনোই বলতে পারে না যে, সে নাস্তিক।

তবে আশার কথা, ষোল কোটি মানুষের মধ্যে নাস্তিকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যাবে, এত কম। অন্যদিকে শঙ্কার কথা হল, কম হলেও এরা কখনোই বসে নেই। মানুষের বিশ্বস্ত সমাজে সারাক্ষণই এরা সিঁদ কাটছে ইঁদুরের মতো। এদের নির্বিরাম তৎপরতায় বাংলাদেশে এখন অনেক ইঁদুরের গর্ত। দেশের স্বাধীনতার ভিত্তিভূমির সুরক্ষার প্রয়োজনে এই ইঁদুরগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই বাংলাদেশের বিশ্বাসী জনগণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আন্দোলন হলো 'নাস্তিক খেদাও আন্দোলন', সবচে' গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান হলো : 'নাস্তিকমুক্ত বাংলাদেশ চাই!

©https://www.hadithbd.com

নাস্তিকদের প্রতিরোধের উপায়

এখন থেকেই এই আন্দোলনের নতুন রূপ দেয়া দরকার। ইসলামী ঘরানার অনেক ভাইয়ের ফেসবুক আইডি আছে। নামে বেনামে কিছু likepage তৈরি করে সেগুলোকে কেন্দ্র করে সকলকে জমায়েত করতে হবে। এই পেজগুলোয় সাধারণ মানুষের প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সারাদেশের মেধাবী ছেলেদের দিয়ে এডমিন প্যানেল তৈরি করতে হবে।

আঠারোর্ধ্ব বয়সী মুসলিমকে মার্জিত অনলাইনার হতে উৎসাহিত করতে হবে। পেজগুলোয় ধর্মীয় বিষয়ের চেয়ে সামাজিক বিষয় বেশি পোস্ট দিতে হবে। সাধারণ ব্রাউজারদের সামনে নাস্তিকদের ভণ্ডামি ও আসল মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে। অনেকের কাছে এই প্রস্তাবগুলো অবান্তর মনে হতে পারে। তাদের বলব, কয়েকদিন নিয়মিত সাধারণ অনলাইনার হয়ে এই পরিবেশগুলো ঘুরে দেখুন। অতপর আপনিও আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন এসব করা উচিত। অসম্ভব মনে হলেও কিছু করার নেই। ভুলে যাবেন না আরব বসন্তের সিরিয়া, লিবিয়া, মিসর এমনকি তথাকথিত শাহবাগের আন্দোলনের ডাকও কিন্তু অনলাইনেই দেয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম কাজ হবে নাস্তিকদের কুকীর্তি জাতির সামনে প্রকাশ করা, দ্বিতীয় কাজ তালিকা করে ওই সব কুলাঙ্গারের ব্লগ বাতিলের জন্য সরকারকে আল্টিমেটাম দেওয়া, তৃতীয় কাজ ইসলামী ব্লগ তৈরি করা এবং চতুর্থ কাজ আগামী তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে সতর্কতার সঙ্গে ওই খারাপ ব্লগগুলো থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা।

এ ক্ষেত্রে সবচে বেশি মনোযোগ দিতে হবে শিক্ষকতা ও মিডিয়ার প্রতি। কারণ, এ দুই পেশায় যুক্ত হয়েই বামধারার লোকেরা তাদের শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামবিরোধী নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করেছেন। মেধাবী ইসলামপ্রিয় শিক্ষানুরাগী লোকদের আজ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এ দুই পেশায়। আমরা যত দেরি করব, তত বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। অতিসত্ত্বর আমাদের এদিকে মনোযোগী হতে হবে।

©https://www.hadithbd.com

দরকার ইসলামের সপক্ষে একাধিক মিডিয়া

বাংলাদেশে যখনই ইসলামের ওপর আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় কোনো বিপদ বা আগ্রাসন এসেছে, তখনই নতুন করে ইসলামপন্থীদের নিজস্ব মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেন সবাই। সবগুলো মিডিয়া যখন একযোগে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানায়, নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে ইসলামের স্বপক্ষের লোকদের খলনায়ক আর প্রকৃত খলনায়কদের নায়ক বানায়, তখনই সবাই নিজেদের মিডিয়ার শূন্যতা বোধ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে না হতেই এই বাস্তবতা ও অভাবের কথা ভুলে যান। দিনদিন যেখানে আধুনিক মিডিয়ার শাখা-প্রশাখা ডালপালা মেলছে, সেখানে বাংলাদেশে প্রকৃত ইসলামপ্রেমী একটি জাতীয় দৈনিকও নেই। এই নাস্তিক ও তাদের দোসরদের মোকাবেলায় এখনই অনতিবিলম্বে দরকার একাধিক জাতীয় দৈনিক এবং একাধিক মিডিয়া।

সোশ্যাল মিডিয়া, নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয়

হযরত মাওলানা মুফতি তকী উছমানী

মুসলিমের সন্তান তার মা-বাবার জন্য পার্থিব নিআমতই শুধু নয়; আখিরাতের সঞ্চয় ও শ্রেষ্ঠ সদকায়ে জারিয়াও বটে, যদি সে সন্তান হয় ঈমানদার।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ঈমান-লুটেরার দল কীভাবে নীরবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঃযরংস ও নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবিত করছে তার কিছু বৃত্তান্ত এই লেখায় উপস্থাপন করব। দৃশ্যত অধ্যয়ন ও এন্টারটেইনমেন্টের সদুদ্দেশ্যে যে মা-বাবা তাদের কচিকাঁচা সন্তানকে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন বিশেষভাবে তাঁরা এই লেখাটা পড়–ন। আল্লাহ না করুন আপনার সন্তানও হয়ত এই ফিতনার শিকার হয়ে ঈমান হারানোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অথচ সে সম্পর্কে আপনার বিন্দু-বিসর্গও জানা নেই।

করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ ও পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ এখন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণত মুসলিম পরিবারের ১৫-২০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরাই এতে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। উদাহরণ এক-দুটি নয়, শত শত। উলামায়ে কেরাম দিন-রাত তা লক্ষ্য করছেন।

বিষয়টি এই যে, সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারে এমন অসংখ্য একাউন্ট আছে, যেগুলোর কাজই হচ্ছে দিন-রাত বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে যাওয়া, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপত্তি তোলা এবং আলিম-উলামাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের নিশানা বানানো।

এদের অধিকাংশই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন এনজিওর সাথে যুক্ত এবং এদের টার্গেটই এটা। এগুলোর নামের ধরন সাধারণত এরকম হয়ে থাকে-

Ex-Muslims Together

Atheist Muslims

Muslims Liberated

Islam Exposed
এদের কর্মী ও সহমত পোষণকারী হিসেবে রয়েছে শত শত ছেলে-মেয়ে, যারা ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত। এদের অধিকাংশই দ্বীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রোডাক্ট। এরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের তরুণ-তরুণীদের দলে ভেড়ানোর কাজে ব্যস্ত। এরা দৃশ্যত মুসলিম-সংশ্লিষ্ট নামের একাউন্ট রাখলেও মতাদর্শগতভাবে নাস্তিক্যবাদী।

এদের আলোচনার ধরন অনেকটা এরকম...

প্রথম দিকে ইসলামের উপর প্রশ্ন তোলা হয় না; বরং কিছু কিছু ইসলামী বিধানকে সাইন্স ও লজিকের মানদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু দ্বীনী বিষয়ই নির্বাচন করা হয়, যা সাইন্স দ্বারাও প্রমাণিত। এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই মানসিকতা গঠন করা হয় যে, দ্বীনের সকল বিধান বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বিজ্ঞান যা সমর্থন করে তা নিঃসন্দেহে সত্য।

এর পরের ধাপে আলোচনায় আনা হয় ঐসকল বিষয়, যা সাইন্সের আওতার ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলি, অহী, মিরাজ ইত্যাদি, যা একান্তই গায়েবের বিষয়। এগুলোও সন্দেহাতীতভাবে সত্য তবে সাইন্সের আওতা-বহির্ভূত। কিন্তু ইতিপূর্বে যেহেতু মানসিকতাটা এভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যা নিরূপণের অব্যর্থ মাপকাঠি হচ্ছে সাইন্স, তাই এ ধাপে এসে এই মৌলিক আকীদাগুলো সম্পর্কে সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। (দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকা আর সাইন্সের ব্যাপারে অতিউৎসাহের ফলে কোন্ বিষয়টি সাইন্সের আওতাভুক্ত আর কোন্টি তার আওতা-বহির্ভূত- তা উপলব্ধি করার ফুরসত থাকে না।)

এর পরের ধাপে আরো অগ্রসর হয়ে সরাসরি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত জীবনের নির্দিষ্ট কিছু দিক আলোচনায় নিয়ে আসা হয়। এ পর্যায়ে এমন কিছু বিষয়কে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়, যা দ্বীন সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তিদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরের। যেমন দাস-প্রথা, নারী-পুরুষে সমতা, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একধিক বিয়ে ও দাসী, বিয়ের সময় আম্মাজান আয়েশা রা.-এর বয়স ইত্যাদি।

প্রজ্ঞাবান মুসলিমের কাছে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট, কিন্তু কাঁচা বুদ্ধির আবেগপ্রবণ মুসলিম ছেলে-মেয়ের কাছে, যারা একে তো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অন্যদিকে পশ্চিমা চিন্তা-ধারা ও জীবন-ধারায় প্রভাবিত, এ বিষয়গুলো খুবই অস্বস্তিকর ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে দ্বীন ও উলামায়ে দ্বীনের সাথে মেলামেশা না থাকায় এসবের সঠিক স্বস্তিদায়ক উত্তর পাওয়ারও তাদের রাস্তা থাকে না। এরা তখন গুগল ও ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়, যেখানে নাস্তিক্যবাদী ও ধর্ম-বিদ্বেষীদের পূর্ব প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ওয়েবসাইট তাদের সন্দেহ-সংশয়কে অটল বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে। এরপর ঈমান খুব দ্রুত বিদায় নিয়ে যায়।

হজ্ব-কুরবানী থেকে শুরু করে বিয়েশাদী ও মীরাছের বিধি-বিধান পর্যন্ত ইসলামের প্রত্যেক বিধানকে পশ্চিমের সরবরাহকৃত মাপকাঠিতে পরীক্ষা করার পর অবশেষে একে মনগড়া ধর্ম আখ্যা দিয়ে নীরবে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়। (নাউযু বিল্লাহ)

প্রকাশ্যে ইসলামের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখী ও আল্লাহ্র অস্তিত্বের অস্বীকারের পর্যায়টা এর পরে আসে। এরপর এই ছেলে-মেয়েগুলোই ঐসব সংগঠনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবকেও দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করতে থাকে।

এই গোটা বিষয়টা আমাদের আশেপাশেই ঘটছে। আমাদের পাশে বসেই ১৫-২৫ বয়সের তরুণ-তরুণীরা টুইটার, ফেসবুক ইত্যাদিতে এই কাজ করে চলেছে, কিন্তু আমরা একেবারেই বেখবর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সন্তান-সন্ততিকে আমরা কীভাবে রক্ষা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নীচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন :

-মাঝেমধ্যে আলেমদের কাছে ও বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে নিজেও যান, সন্তানকেও নিয়ে যান। যেন তাদের সাথে স্বাভাবিক পরিচয় গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

-সন্তান-সন্ততিকে কাছে টেনে নিন, ভালবাসুন। তাদের সমস্যাগুলো শুনুন ও পরামর্শ দিন। তাদের সাথে নিজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করুন এবং তাদেরকে নিজের চিন্তা-ভাবনার ধারক হিসেবে গড়ে তুলুন।

আপনি যদি তাদের দূরে ঠেলে রাখেন তাহলে বিপথগামী লোকেরা ওদের কাছে টেনে নেবে।

-ধীরে ধীরে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানুন এবং ঘরেও তা আলোচনা করুন।

-ছেলে-মেয়ে ছোট হলে তাদের জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করুন।

-অতি প্রয়োজন ছাড়া বাচ্চাদের হাতে স্মার্টফোন দেয়া থেকে বিরত থাকুন নিজেও তা থেকে বিরত থাকুন।

-একান্ত দিতে হলে শর্তসাপেক্ষে দিন, অসময়ে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুন। রাতে সবার ফোন নিজের কক্ষে জমা রাখুন। এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করুন।

-বিনা কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো থেকে নিজেও বাঁচুন, ছেলে-মেয়েকেও বাঁচান।

-ছেলে-মেয়ের সামনে সবসময় ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

-যে কোনো প্রশ্ন বা সংশয়ের জবাব পেতে ইন্টারনেটের সামনে না বসে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হোন।

ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সাফল্য, ঈমানকে নিরাপদে কবরে নিয়ে যাওয়া। ছেলে-মেয়েকে ঈমান-লুটেরাদের কবল থেকে রক্ষা করুন। যেন আমাদের আগামী প্রজন্মের মাঝেও দ্বীন ও ঈমান বাকি থাকে।

আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন- আমীন।

অনুবাদে : মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

©https://www.alkawsar.com

নাস্তিকদের সাথে কথোপকথন

লেখক: ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী অনুবাদক: রাশেদুল আলম

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করবো। ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। সাথে সাথে এটা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শক্ত দলিলও বটে। এর মাধ্যমে নাস্তিকদের সাথে আমাদের সালাফদের (পূর্বসূরিদের) আচরণের একটা ধারণা পাওয়া যাবে যে, নাস্তিকদের সাথে আমাদের সালাফদের ব্যবহার কীধরনের ছিলো? নাস্তিকদের অস্তিত্ব কি পূর্বেও ছিল? সালাফগণ কীভাবে তাদের মুকাবেলা করতেন? বর্তমানেও কি নাস্তিকদের অস্তিত্ব আছে? তাহলে আমরা কীভাবে তাদের মুকাবেলা করবো?

বর্তমান সময়ে নাস্তিকদের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। সেই সাথে বাড়ছে তাদের প্রচারণা-প্রতারণার মানুষের মধ্যে সংশয়-বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রবণতা। বিভিন্ন সেমিনারে, টেলিভিসনের বিভিন্ন চ্যানেলে এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

সুতরাং তাদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে? তাদের সাথে আচরণ-উচ্চারণের ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা সালাফদের বর্ণিত ঘটনাগুলো শিক্ষা গ্রহণ করবো?

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ‘সুমানিয়া সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোকের সাথে মুনাযারা করলেন। (সুমানিয়া’ হলএক নাস্তিক-জনগোষ্ঠী, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; তারা মনে করে গ্রহ-নক্ষত্রেভরা এই বিশাল আকাশ এবং নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত ও পশুপাখি সমেত এই বিস্তৃত ভূপৃষ্ঠ এমনি এমনিই হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে গেছে; এগুলোর কোনো স্রষ্টা নেই, এগুলো সৃষ্টির পিছনে কোনো সৃষ্টিকর্তার হাত নেই।)

দ্বিপাক্ষিক দীর্ঘ বিতর্কের পরও যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা গেল না তখন উভয় পক্ষই এই সিদ্ধান্তে একমত যে, আগামীকাল সকলেই আমিরের দরবারে সমবেত হবে এবং সেখানে তাদের বিতর্কের ইতি টানবে। পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নাস্তিকরা আমিরের দরবারে এসে হাযির হল; কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ সময়মত উপস্থিত হন নি। তিনি ইচ্ছে করেই কিছু সময় দেরি করলেন। এদিকে নাস্তিকরা এসে যখন আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ কে পেলো না; তারা তার আসতে বিলম্ব হতে দেখে হৈচৈ শুরু করে দিল, এবং আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারীদের অবজ্ঞা করে বলতে লাগলো, কোথায় তোমাদের

আলেম? কোথায় তাোমাদের আবু হানিফা? সে দেরি করছে কেনাে? সে তাে ওয়াদা লঘন করছে।

তাোমরা কি এমন লাোকের অনুসরণ করাে; এমন লাোককে তাোমাদের নেতা মনে করাোযার ওয়াদাই ঠিক নেই; যে কথা দিয়ে কথা রাখে না, সময় মত আমাদের মজলিসে তাচ্ছিল্য করছিলাে। এদিকে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ইচ্ছা করেই দেরি করছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ বিলম্বের পর মজলিসে এসে উপস্থিত হলেন। নাস্তিকরা যখন তাঁকে দেখল তখন সকলে একযাোগে তাঁর দিকে প্রশ্নের বাণ ছুঁড়ে দিয়ে বলল- আপনি দেরি করলেন কেনাে? আপনি দাবি করেন আল্লাহ আছেন, আর আপনি তাকে ভয়ও করেন, তিনি আপনার প্রতিটি বিষয়ের হিসেব নিবেন, আর তিনিই তাে সকলকে ওয়াদা ঠিক রাখতে বলেছেন, তাহলে আপনার এই কথার বাস্তবতা কোথায়?

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, হে লাোক সকল! তাোমরা প্রথমে আমার কথা শুনাে তারপর আমার ব্যাপারে যে ফায়সালা করবে আমি তা মাথা পেতে মেন নিবাে; কিন্তু আমার কথা শুনার পূর্বে আমার ব্যাপারে কোনাে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। আমি সঠিক সময়েই উপস্থিত হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু নদীর পারে এসে দেখি সেখানে কোনাে নৌকা নেই। অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কোনাে নৌকার দেখা পেলাম না; আমি তখন এখানে উপস্থিতির ব্যাপারে এক ধরনের সন্দেহেই পড়ে গেলাম। আর ঠিক তখনই চার দিক অন্ধকার করে প্রচণ্ড এক ঝড় শুরু হল এবং আমার পাশের বড় একটি গাছের উপর বিশাল এক বজ্র পড়ল আর সাথে সাথে গাছটি দুই টুকরাে হয়ে এমনি এমনি একটু করে মাটিতে আর একটু করে পানিতে পড়লাে। আমি বলতে পারবাে না, হঠাৎ কোথেকে একটা লাোহার টুকরাে এলাে এবং গাছের একটি ডালের সাথে একা একাই লেগে একটি কুড়াল হয়ে গেল। অতঃপর কুড়ালটি একা একাই গাছের ডালপালাগুলাে কাটতে লাগলাে আর গাছটি এমনি এমনি ফেড়ে তক্তা হতে লাগলো।

তারপর এমনি এমনি হাতুড়ি আর পেড়েক এসে পিটিয়ে পিটিয়ে একটা নৌকা তৈরি করে ফেললাে। আমি অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম, এরই মধ্যে নৌকাটি পনিতে পড়ে আমার সামনে আসলাে আর আমি তাতে চড়ে বসলাম। অতঃপর নৌকাটা একা একাই দাঁড় টেনে টেনে আমাকে নদীর এপার পৌছে দিল। এবার এসাে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করি যে, এই বিশ্বজগৎ একা একাই সৃজিত হয়েছে, না-কি এর সৃষ্টির পিছনে রয়েছে কোনাে এক মহান স্রষ্টার নিপুণহাতের ছোঁয়া। এমন আশ্চর্য ঘটনা শুনে নাস্তিকরা বলল, থামেন! আগে বলেন, আপনি কি সুস্থ আছেন? আপনার মাথা কি ঠিক আছে, না আপনি পাগল হয়ে গেছেন? তিনি বললেন, আমি ঠিকই আছি, আমি অসুস্থ নই এবং আমার বিবেক-বুদ্ধিও নষ্ট হয় নি।

তারা বললাে, এটা কীভাবে সম্ভব? এটা কি কোনাে বিশ্বাসযােগ্য কথা হতে পারে যে, এমনি এমনি একটা গাছ ফেড়ে তক্তা হয়ে নৌকা তৈরি হয়ে গেল, অতঃপর তা একা একাই মানুষ পারাপার করল?!

ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম একটা বজ্র এসে একটা গাছের উপর পড়েছে, অতঃপর গাছটি দুই টুকরাে হয়ে এক টুকরাে পানিতে আরেক টুকরাে মাটিতে পড়েছে; কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব যে, এমনি এমনি একটা নৌকা তৈরি হয়ে যাবে, অতঃপর তা কোনাে মাঝি ছাড়া একাকী দাঁড় টেনে মানুষ পারাপার করবে, অথচ একটা নৌকা তৈরি করতে কত লাােকের প্রয়াােজন হয়! কেউ গাছ কাটবে, কেউ তক্তা বানাবে, কেউ পেরেক গেঁথে কাঠ লাগাবে, কেউ দাঁড় টানবে ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন মানুষের প্রয়াােজন; কিন্তু আপনি বলছেন, কোনাে মানুষ ছাড়া একাকী একটা গাছ কেটে তক্তা হয়ে নৌকা তৈরি হয়ে গেছে, অতঃপর কোনাে মাঝি ছাড়া একাকী তা মানুষ পারাপার করছে! অসম্ভব! এটা হতে পারে না; এটা কোনাে বিশ্বাসযাাগ্য কথা হতে পারে না?

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনারাই বলছেন,এই বিশাল আসমান ও তারগ্রহ-নক্ষত্র এবং এই বিস্তৃত যমিন ও এর নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত ও পশু-পাখি সবকিছু এমনি এমনি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে গেছে; এগুলাে সৃষ্টির পিছনে কোনাে সৃষ্টিকর্তার হাত নেই, অথচ সেই আপনারাই আবার বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, ছাােট্ট একটা নৌকা হঠাৎ করে একাকী কোনাে কারিগর ছাড়াই তৈরি হয়ে একাকী মানুষ পারাপার করছে? তখন অবিশ্বাসী নাস্তিকরা নিরুত্তর হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা যালেম সম্প্রদায়কে কখনাে হেদায়েত দেন না।

প্রিয় ভাই ও বাােনেরা! নাস্তিকতার মহামারি ইউরাােপে শুরু হয়ে এর ঢেউ আমাদের সমাজে, মুসলিম দেশেও এসে আছড়ে পড়ছে। ইউরাােপে নাস্তিকতার সৃষ্টি ও প্রসারকে আশ্চর্যজনক কিছু মনে করি না; বরং সেখানে নাস্তিকতার সৃষ্টি ও বিস্তার উভয়টাই স্বাভাবিক বিষয়,কারণ সেখানে এমন মানুষের বসবাস, যারা সত্য ধর্মের আলাে ও সঠিক দীন থেকে অনেক দূরে, যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। তারা বলে আল্লাহ তাআলার সন্তান রয়েছে; ইসা আ. হলেন আল্লাহর সন্তান। দেখুন,কত উদ্ভট-অদ্ভুত এদের দাবি যে, আল্লাহর সন্তান হল একটি, আর আল্লাহর সন্তান (তাদের ধারণানুযায়ী) ইসা আ.-এর কোনাে সন্তান নেই!! এটা হলসম্পূর্ণ বাস্তব বহির্ভূত এক দাবি; গণ্ডমূর্খ ছাড়া কোনাে জ্ঞানী ব্যক্তি তা মেনে নিতে পারে না। সাথে সাথে সেখানকার মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তিপূজায় ডুবে থাকে। বিশেষ করে যুবক-যুবতী সম্প্রদায়।

তারা বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতায় লিপ্ত, তারা কোনাে ধরনের ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি সামন্যও হৃক্ষেপ করে না- এরপর চলে আসে সাোজা নাস্তিকতার দিকে, কেননাই-বা আসবে না? বরং এটাই হওয়ার কথা, কারণ তারা যাচ্ছেতাই করতে চায়। যখন খুশি যেভাবে খুশি মদ পান করতে চায়। যেখানে খুশি যার সাথে খুশি যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হতে চায়। তারা যা ইচ্ছে তাই খেতে চায়; যখন-তখন যেখানে ইচ্ছে ঘুমাতে চায়; যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠতে চায়। এখন তারা যদি দীন মান্য করে, তাহলে তাদেরকে বলা হবে- এটা তাে হারাম, এটা করা যবে না, এটা করলে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন, তাোমার পক্ষেএকাজের অনুমতি নেই, এর জন্যে তাোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। যখন এ ধরনের আহ্বান তার মন থেকে একের পর এক বেরুতে থাকে, তখন মনচাহি জিন্দিগি কাটাতে হলে তাকে খাোদ দীন থেকেই বেরুতে হবে, আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়ে তাকে নাস্তিক্যবাদই গ্রহণ করতে হবে; তাহলেই সে সবকিছুই যেভাবে যখন খুশি করতে পারবে।

বর্তমানে ইউরাোপে নাস্তিকতারব্যাপক ছড়াছড়ি। আমি নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে আমি ইউরাোপের এক খৃস্টান ভূমিতে ছিলাম; সেখানের বেশিরভাগ মানুষই খৃস্টান, দেশের এখানে-সেখানে সর্বত্র গির্জা বিদ্যমান, সব জায়গা থেকে গির্জার ঘণ্টার আওয়ায আসতে থাকে। রাস্তার মাোড়ে মাোড়ে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি বা তার ছবি টানানাো থাকে (যদিও এটা সম্পূর্ণ মনগড়া-মিথ্যা ছবি)। আমি তাদের একটা পরিসংখ্যানের রিপাোর্টে দেখেছি। পরিসংখ্যানটি করা হয় কয়েকটি প্রশ্নের উপর; তার একটি প্রশ্ন হল, তাোমার ধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তরে সেখানের ১৩% লাোক লিখেছে, আমার ধর্ম হল ‘খৃস্টধর্ম’। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে, তুমি কি কোনাে কারণে জীবনে একবার হলেও গির্জায় প্রবেশ করেছাে? হাোক তা যে কোনাে কারণে, যেমন পড়ালেখা, বিবাহ বা অন্য কোনাে উপলক্ষে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মাত্র ৭% লাোক হ্যাঁ বলেছে। অর্থাৎ তারা জীবনে একবার হলেও গির্জায় প্রবেশ করেছে। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে তুমি কি প্রতি সপ্তাহে গির্জায় প্রবেশ করাে? মাত্র ১% লোোক বলেছে, তারা সপ্তাহে একদিন গির্জায় প্রবেশ করে।

ইউরাোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন বৃটেন, জর্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ থেকে যেসকল লাোক আমাদের কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, জুমার পর নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে, আমি তাঁদের অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনি জীবনে কতবার গির্জায় প্রবেশ করেছেন? তাঁদের অনেকেই এই উত্তর দেয় যে, সে জীবনে এতবারের জন্যেও গির্জায় প্রবেশ করেনি, অথচ তাদের কারাে বয়স ত্রিশ, কারাে চল্লিশ বা তার চেয়ে কম-বেশি। সুতরাং তাদের সমাজে নাস্তিকতা ছড়ানাো আশ্চর্যের কিছু না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

হল আমাদের দেশে, মুসলিম সমাজে নাস্তিকতার প্রচার-প্রসার। এমন সমাজে নাস্তিক্যবাদ বিস্তার করা-যেখানে জনগণের ধর্ম ইসলাম, যারা পরকালে বিশ্বাসী, যাঁরা জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ইমান রাখে, যাদের কাছেরয়েছে অবিকৃত মহান আল-কুরআন। যখন তাদের মধ্যে নাস্তিকতা ছড়ায় তখন বুঝতে হবে যে, কোথাও কোনা‍ে সমস্যা হচ্ছে, কোথাও কোনা‍ে ঝামেলা হচ্ছে, যার প্রতিকার ও প্রতিশেধক প্রয়া‍েজন; যার সংশা‍েধন অত্যাবশ্যক।

পূর্বে এমন কিছু গর্দভ লা‍েক ছিলা‍ে, যারা নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করতা‍ে। একবার এদেরই একজন এক আলেমের নিকট গিয়ে বললা‍ে, আমি সৃষ্টি করতে পারি- আপনি কি এটি বিশ্বাস করেন? তখন আলেম বললেন, আচ্ছা আপনি সৃষ্টি করতে পারেন!!? সে বললা‍ে, হাঁ আমি সৃষ্টি করতে পারি। আলেম বললেন, ঠিক আছে আমাকে কিছু একটা সৃষ্টি করে দেখান, তখন লা‍েকটি উক্ত আলেমকে একটি কর্তিত গাছের নিকট নিয়ে গেল। অতঃপর লা‍েকটি গাছের মধ্যে খা‍েদাই করে একটি গর্ত তৈরি করে ভিতরে কিছু গা‍েশতের টুকরা‍ে রেখে তার মুখ বন্ধ। করে দিল, এবং সেই আলেমকে বললা‍ে, একমাস পর এখানে আবার আসতে হবে। অতঃপর একমাস পার হওয়ার পর লা‍েকটি উক্ত আলেমকে নিয়ে আবারও সেই গাছের নিকট আসল।

তখন কী হল?. একমাস পর যখন আলেম সেই ‘সৃষ্টিকর্তা লা‍েকটির সাথে উক্ত গাছের নিকট আসল, তখন লা‍েকটি অগ্রসর হয়ে গাছের মধ্যে সৃষ্ট সেই গর্তের মুখ থেকে আবরণটি সরিয়ে দিলা‍ে, আর তখন দেখা গেল সেখানে। কিছু পা‍েকামাকড় হাঁটাহাঁটি করছে। তখন লা‍েকটি আলেমকে বললা‍ে, এই দেখুন আমি এই পা‍েকাগুলা‍ে সৃষ্টি করেছি। তখন আলেম তাকে বললেন, আপনি এগুলা‍ে সৃষ্টি করেছেন? সে বললা‍ে, হ্যা আমিই এগুলা‍ে সৃষ্টি করেছি। আলেম বললেন, তা‍েমার সৃষ্টির সংখ্যা কত? সে বললা‍ে, আমি জানি না। আলেম বললেন, তুমি সৃষ্টি করেছা‍ে অথচ তুমিই তা‍েমার সৃষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞাত!! আচ্ছা বল দেখি, তা‍েমার সৃষ্টির মধ্যে কতটি পুরুষ আর কতটিমহিলা? সে বললা‍ে, আমি জানি না। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা বল দেখি, এই পা‍েকাগুলা‍ে যে হাঁটছে, এগুলা‍ে এখন কোথায় যাবে, কী খাবে,কতদিন বাঁচবে? সে বললা‍ে, আমি জানি।

তখন আলেম বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি সৃষ্টি করলে অথচ তুমি এগুলা‍ে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারা‍ে না যে তাদের সংখ্যা কত, পুরুষ ক’টি, মহিলা ক’টি, তারা কী খাবে, কোথায় যাবে, কতদিন বাঁচবে? তখন নাস্তিক লা‍েকটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এই নির্বোধের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আসলে যারা আল্লাহর প্রভূত্বের ক্ষেত্রে অংশীদারত্ব দাবি করে তারা নির্বোধ; তাদের কথার কোনা‍ে ভিত্তিই নেই। কোনা‍ে বুদ্ধিমান লা‍েক তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না; এমনকি সমাজেও তাদের কথার কোনা‍ে ধর্তব্য

নেই। যুবাইর ইবনু মুতইম রা. তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় এসে মসজিদের নিকটে চলে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববিতে সাহাবায়ে কেরাম রা.কে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন এবং সুরা তুর তেলাওয়াত করছিলেন।

মসজিদের বাহির থেকে যুবাইর রা. তেলাওয়াত শুনছিলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন – 'তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?' [সুরা তুর, আয়াত : ৩৫]
যুবাইর ইবনে মুতইম রা. বলেন, যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করা হল, তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার অন্তর খুশিতে উড়তে শুরু করছে। আমি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, বাস্তবেই কি অনস্তিত্ব থেকে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, না-কি আমাদেরকে আমাদের থেকেই সৃজন করা হয়েছে?

একবার এক বেদুইনকে প্রশ্ন করা হল, তুমি কীভাবে তােমার প্রতিপালককে চিনতে পেরেছাে? বেদুইন লােকটি বলল, এই-যে বিশাল আকাশ ও এর কক্ষপথ; এই বিস্তৃত ভূমি ও এর উপত্যকা-গিরিপথ এবং এই মহাসমুদ্র ও এর ঢেউ-তরঙ্গমালা- এর সবকিছুই কি মহাজ্ঞানী একজন স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে না? পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই মহান স্রষ্টা এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে, আর একারণেই আমাদের সালাফগণ পৃথিবীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টির মাধ্যমেও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করতেন। যেমনিভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: "তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি ভারী মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই; অতঃপর এ-মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি; অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে এদেরকে পুনরুত্থিত করবাে, যাতে তােমরা চিন্তা করকে পারাে।" [সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৭]

একবার এক মুলহিদ তথা নাস্তিক এক বালককে প্রশ্ন করলাে, তুমিকি মুসলিম? বালক ছেলেটি ছিলাে বুদ্ধিমান সে বলল, হাঁ আমি মুসলিম।

নাস্তিক : অর্থাৎ তুমি মুসলিম, তুমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাে?

বালক : হাঁ আমি মুসলিম, আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

নাস্তিক : তুমি কি তাকে কখনাে দেখেছাে?

বালক : না। আমি তাকে কখনাে দেখে নি।

নাস্তিক: তুমি কি তার কথা কখনাে শুনেছাে?

বালক : না আমি তার কথা কখনাে শুনি নি।

নাস্তিক : তুমি কি তাকে কখনাে স্পর্শ করেছাে?

বালক : না। আমি তাকে কখনাে স্পর্শ করি নি।

নাস্তিক : তুমি কি কখনাে তাঁর ঘ্রাণ খুঁকেছাে?

বালক: না আমি কখনাে তাঁর ঘ্রাণ শুকি নি।

নাস্তিক : তুমি কি কখনাে তাঁর স্বাদ গ্রহণ করেছাে?

বালক: না আমি কখনাে তার স্বাদ গ্রহণ করি নি।

নাস্তিক : তাহলে তােমার রব আল্লাহর কোনাে অস্তিত্ব নেই,কারণ তুমি যাকে কখনাে দেখাে নি, যার কথা কখনাে শুনাে নি, যাকে কখনাে স্পর্শ করােনি, যার স্বাদ গ্রহণ করােনি, যার ঘ্রাণ ওঁকো নি তার কোনাে অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ যাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না তার কোনাে অস্তিত্ব নেই।

বাচ্চাটি ছিলাে বুদ্ধিমান, সে তাকে উল্টো প্রশ্ন করে বললাে, আপনার কি আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি আছে?

নাস্তিক : হ্যাঁ আছে।

বালক : আপনি কি আপনার বিবেক কখনাে দেখেছেন?

নাস্তিক : না, আমি তা কখনাে দেখি নি।

বালক: আপনি কি এর কোনো কথা কখনো শুনেছেন?

নাস্তিক : না আমি এর কোনো কথা কখনো শুনি নি।

বালক : আপনি কি একে কখনো স্পর্শ করেছেন?

নাস্তিক : না, আমি একে কখনো স্পর্শ করি নি।

বালক: আপনি কি কখনো এর ঘ্রাণ খুঁকেছেন?

নাস্তিক : না আমি কখনো এর ঘ্রাণ শুকি নি।

বালক : আপনি কি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করেছেন?

নাস্তিক : না আমি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করি নি।

বাচ্চাটি তখন তাকে বললো, তাহলে তো আপনি পাগল; আপনার কোনো বিবেক নেই। নাস্তিক লোকটি বলল, না আমি পাগল নই, অবশ্যই আমার বুঝশক্তি আছে।

বালক ছেলেটি বললো, আপনি কীভাবে জানলেন যে, আপনার বুঝশক্তি আছে?

নাস্তিক : আমি এর প্রভাব টের পাই। অর্থাৎ এর বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমি আমার আকলের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি; তাহলে কীভাবে বলবো যে, আমার কোনো বিবেক নেই; আমি পাগল?

নিদর্শন দেখেই তো বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে; যেমন পূর্ণ বয়স্ক এক লোক রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে হাঁটছে, বাচ্চাদের সাথে খেলছে, অথবা রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির প্রতি কোনো ক্ষেপই করছে না; এই লোককে দেখে মানুষ বলবে, লোকটি পাগল, তার বিবেক নেই। তারা কীভাবে তাকে চিনতে পারলো? তারা কি তার মাথার খুলি ভেঙ্গে মগজ খুলে দেখেছে? না, তারা তা দেখেনি; তবুও তারা তাকে চিনতে পেরেছে। তার কার্যাবলীর নিদর্শন দেখে চিনতে পেরেছে যে, তার কোনো বিবেক নেই; সে পাগল। অনুরূপভাবে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের বিভিন্ন নিদর্শন দেখে জানা যাবে যে, তার জ্ঞান আছে। যখন দেখা যাবে, সে সবকিছু

সঠিকভাবে সম্পাদন করছে, উল্টোপাল্টা কিছু করছে না, তখন মানুষ তাকে বলবে, সে জ্ঞানী, তার বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে।

একটা প্রশ্ন : আমরা কীভাবে জানবাে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে?

এর উত্তর হল, আমরা তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে; আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত দেখে এবং আমাদের নিকট যে অবিকৃত কুরআন আছে, এ-মুজেযা দেখে জানতে পারবাে যে, আল্লাহ আছেন আর এসবকিছুই বলে দেয় যে, এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আফসােস! বর্তমানে নাস্তিকদের সংখ্যা অনেক; যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা যখন ইসলামে প্রবেশ না করে এবং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে তখন তাদের উপর নেমে আসে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নানা দুশ্চিন্তা ও অশান্তি। আর এই অশান্তি-উদ্বেগ থেকে বাচতে তারা বেছে নেয় আত্মহত্যার ভয়াবহ পথ অথবা জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন নেশাজাত দ্রব্যে; যাতে তারা এই দুশ্চিন্তা ভুলে থাকতে পারে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হেদায়েতের উপর রাখুন; এই দীনের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরাে দৃঢ় ও বৃদ্ধি করে দিন; আমাদেরকে সত্যের উপর অটল-অবিচল রাখুন; আমরা যেখানেই থাকি আমাদেরকে পবিত্র-স্বর্গসুখীকরে রাখুন। আমিন!!

©https://quraneralo.com

আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব?

কুলাঙ্গার নাস্তিকদের সঙ্গে আমাদের কোনো ধরনের ভালোবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে না। আমরা তখনই পূর্ণ মুমিন হতে পারব যখন আমাদের সম্পর্কের মাপকাঠি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে সে আমার বন্ধু, যে বাসবে না সে আমার পরম মিত্র হতে পারে না। কারণ, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]

‘আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে, হোন এই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রীয় কেউ। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হল আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।’(সূরা মুজাদালা, আয়াত : ২২)

এদের বন্ধুরূপে গ্রহণের সমালোচনায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ٨٠ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨١ ﴾ [المائدة :٨٠، ٨١]

‘তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সঙ্গে মিত্রতা করতে দেখবে, কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ, নাবী ও তাঁর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেক ফাসেক।’ (সুরা মায়িদাহ, আয়াত : ৮০-৮১)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنَّ اللَّهَ قَالَ :مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। [বুখারী : ৬৫০২]

এইনাস্তিকরা এত বড় অপরাধী যে এদের জন্য এমনকিআল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা বা রহমতেরদু‘আকরাযাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ١١٣ ﴾ [التوبة :١١٣]

‘নবী ও মু’মিনদের জন্য আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয় যখন তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১১৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধআচারণ করবে তাদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগতথা ভালোবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে না। এমনকি স্বঘোষিত নাস্তিক হিসেবে মৃত্যু বরণকারীদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করা যাবে না।

অবশেষে প্রার্থনা, আল্লাহ এই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানের ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করুন। আল্লাহ নাস্তিকদের সুমতি এবং আস্তিকদের মজবুতি (ঈমানে দৃঢ়তা) দান করুন। ইসলামের স্বপক্ষের লোকদের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং মিডিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

©https://www.hadithbd.com

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণাধিক ভালোবাসা আমাদের ঈমানের শর্ত। আল্লাহ ও রাসূলকে যারা কটাক্ষ করে তাদের যদি বুঝিয়ে ফেরানো সম্ভব না হয় তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ ﴾ [الممتحنة :١]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।) তোমরা গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।' (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ১)

অমুসলিমদের সঙ্গে আমরা সুন্দরভাবে সৎ প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য। তবে যারা ধর্মবিদ্বেষী তাদেরকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণের সুযোগ নেই। আমাদের বন্ধুতা-মিত্রতা হবে কেবল ঈমানদারদের সঙ্গে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥ ﴾ [المائدة: ٥٥]

'তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৫৫)

হাদীসে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হই। [বুখারী : ১৫; মুসলিম : ৬৯]

অন্য হাদীসে এসেছে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

'সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে মুহাম্মদের চরিত্র।' [বুখারী : ৬০৯৮; মুসলিম : ৮৬৭]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মুসলিম ও মু'মিন হিসেবে পরিচয় দিতে চাইলে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে হবে। শুধু তাই নয় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও ঘটবে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝে আসবে, তা হলো, আমার পিতা-মাতাকে কেউ গালি দেয় সে সময় আমি যতটুকু রাগ করি তার চেয়েও শতগুণ বেশি রাগ আসবে যখন কেউ আমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে কেউ কোনো কটুক্তি করবে। তবেই আমার ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব।

©https://www.hadithbd.com

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই ইসলাম ধর্ম এমন একটি ধর্ম যা শুধু মসজিদে,সাপ্তাহিক বিশেষ দিনে,শুধু কোরান পাঠে বা বাৎসরিক উৎসবে সীমাবদ্ধ নয়।পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র এই একটি ধর্ম মানব জীবনের জন্য পূর্ণাংগ ধর্ম। যা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত মানুষের সম্পূর্ণ জীবনের ব্যাপারে প্রতিটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে।তাই এই তথাকথিত নাস্তিকদের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে দেখি।

তুমি মানুষকে তোমার প্রতি পালকের দিকে আহব্বান করো হিকমতের সাথেও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।

- সুরা নামল:১২৫

উপদেশ দানের সময় যেসব বিষয় জরুরি বিতর্কের সময়ও সে সব বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি।কেননা বিতর্ক একটি শিক্ষনীয় বিষয়।বিতর্কের সময় পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে যেসব বক্তব্য পেশ করে তাতে বিতর্ককারীরাত বটে শ্রোতারও উপকৃত হয়।বিতর্কের সময় বিপক্ষের বিতার্কিক মূর্খ হলেও তার প্রতি উত্তরে মূর্খতা প্রদর্শন করা যাবে না।

আর অবশেষে বলতে চাই, যে কোনো প্রশ্ন বা সংশয়ের জবাব পেতে ইন্টারনেটের সামনে না বসে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হোন।

দোয়া করি,

আল্লাহতালা আমাদেরকে হেদায়েতের উপর রাখুন; এই দীনের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরাে দৃঢ় ও বৃদ্ধি করে দিন; আমাদেরকে সত্যের উপর অটল-অবিচল রাখুন।

হে আল্লাহ এই দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানের ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করুন। আল্লাহ নাস্তিকদের সুমতি এবং আস্তিকদের মজবুতি (ঈমানে দৃঢ়তা) দান করুন। ইসলামের স্বপক্ষের লোকদের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং মিডিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার তাওফীক দান করুন।” আল্লাহুম্মা আমিন